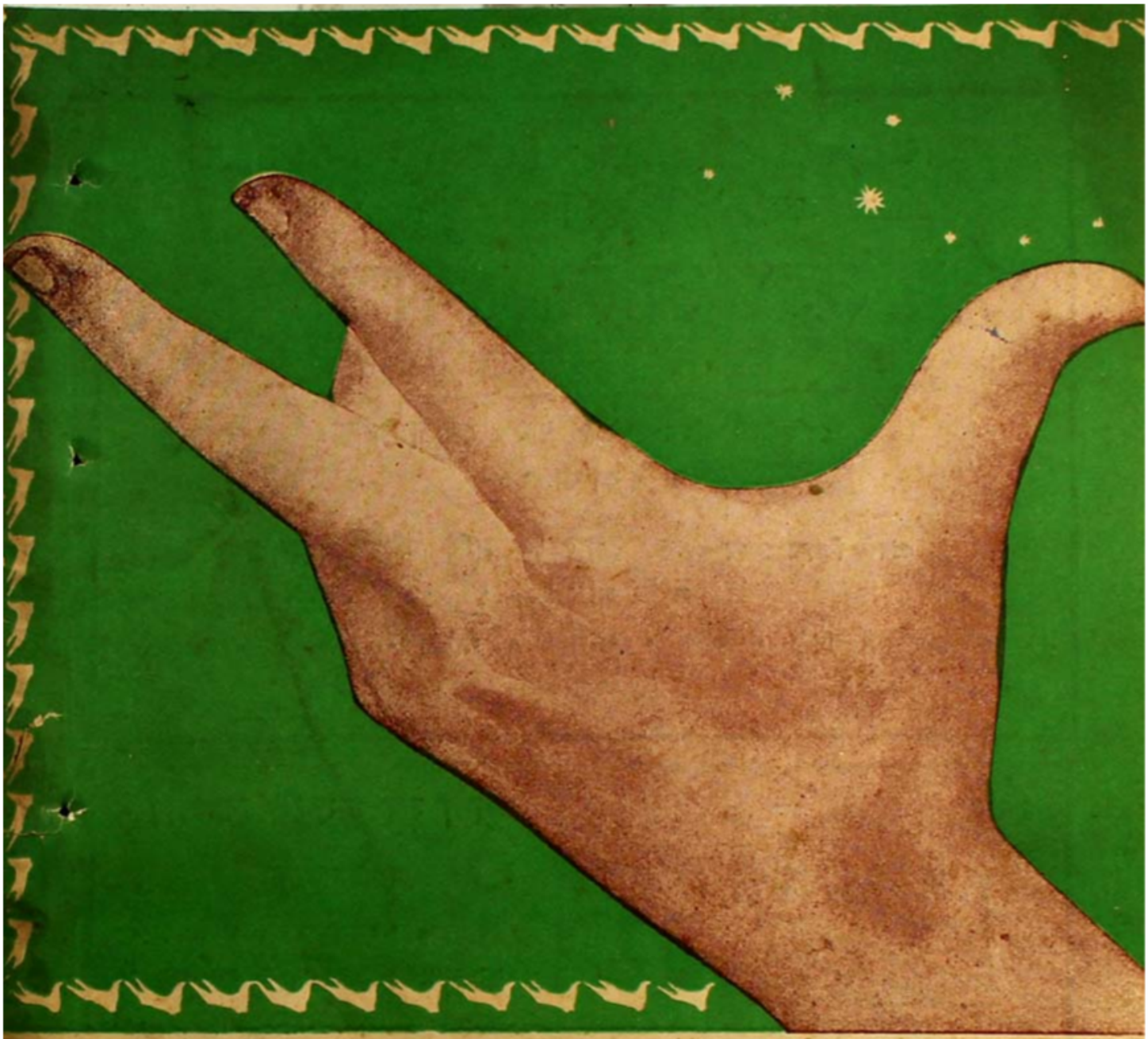

# ভাবমুখে

CALCUTTA UNIVERSITY

কার্তিক ● তেরশ' চুরাশি ● একত্রিংশৎ বর্ষ ● শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ে
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

# হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৬৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৬, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • কটক • ধানবাদ • পাটনা • শিলিগুড়ি • গৌহাটী

ORPHAN'S TEA
For
Health & Economy
ORPHAN TEA SYNDICATE
[illegible]
Phone : 55-2704

যুগে যুগে যার আসা
স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণমাল্যছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[ ২য় সংস্করণ, পরিবর্দ্ধিত ] মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীশ্রীঠাকুর

D.RATAN & Co.
Photographers
PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST. CAL. 6
PHONE : 34 - 5711

★

ডি, রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোটো
ফোন: ৩৪-৫৭১১
২২-১, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬

কার্ত্তিক
সপ্তম সংখ্যা

# শ্রীশ্রীমা সরলা

একত্রিংশৎ বর্ষ
তেরশ' চুরাশি

| | | |
|---|---|---|
| বিজয়া | | শ্রীশ্রীঠাকুর |
| সারদামণি | | শ্রী অর্চ্চনাপুরী |
| রোদন মৌন | | শ্রীসুধেন্দু মল্লিক |
| তপস্বী শ্রীঠাকুর | | শ্রীশরণাপুরী |
| জলৌ জাগর্ত্তি গোপাল: | | স্বামী যোগানন্দ |
| দ্বারাবতীর ভাক | | শ্রীযোগমায়া |
| গীতা বনাম ভাগবত | | আলোচনা : শ্রীপুষ্পিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন<br>অনুলিখন : স্বামী হরিানন্দ |
| গোপালকে মিনতি | ২৬৪ | শ্রীপাচুগোপাল চক্রবর্তী |
| শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি। | ২৬৫ | ডাঃ নলীনী বসু |
| সাধুসঙ্গ | ২৬৭ | স্বামী মৃগানন্দ |
| বিজয়ার আলপনা | ২৬৯ | শ্রী অর্চ্চনাপুরী |
| গীতার বাণী | ২৭০ | সাধনাপুরী |
| পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা | ২৭১ | শ্রীহিমাদ্রিশেখর দত্ত |
| অপরূপ | ২৭৪ | শ্রীসুনীল মুখোপাধ্যায় |
| অক্ষয় উৎসব | ২৭৫ | স্বামী হরিানন্দ |
| নীলকণ্ঠ | ২৭৯ | শ্রীরমেন্দ্র নাথ মল্লিক |
| দুটি কবিতা—"ভাগ্যের দেবা" ও "দেবার ভাগ্য" | ২৭৯ | শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক |
| আকাশ-আঙ্গিনায় | ২৮১ | স্বামী অরূপানন্দ |
| আনন্দময়ী | ২৮১ | শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত |

বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে অভিনব ও উচ্চাঙ্গ নব সংযোজন

## সাহিত্যের সীমানা

শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক

মূল্য : ১৫'০০ টাকা

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯

| | | |
|---|---|---|
| মহাজীবন | ২৮২ | বেলা দেবী |
| গান | ২৮২ | মায়া দত্ত |
| আত্মাহুতি | ২৮২ | শ্রীঅহিভূষণ সরকার |
| হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব | ২৮৩ | ডাঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু |
| খুলনায় সমবায়ের সেবা—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে | ২৮৫ | শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সরকার |
| অখণ্ডানন্দ সত্যানন্দ প্রণাম | ২৮৬ | — |
| আশ্রম সংবাদ | ২৮৬ | — |
| World Psychology | 57 | Sreemat Swami Satyananda Dev |
| On Earthquakes | 58 | Sri M. V Jagannadha Rao |



*With best Compliments from*

# RELIABLE ENGINEERS & TRADERS

**25, Harachandra Mullick Street**

**Calcutta—5**

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

# করুণাবতার

**শ্রীশরণাপুরী** মূল্য : ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি-৩৬

• আশ্রম পক্ষ পঞ্জী অগ্রহায়ণ, ১৩৮৪

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১৯শে নভেম্বর | ৩রা অগ্রহায়ণ | শনিবার | — শ্রীশ্রীজগদ্ধাত্রী পূজা। |
| ২১শে | ৫ই | সোমবার | —একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম। |
| ২৪শে | ৮ই | শুক্রবার | —শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা ও রাত্রে পূর্ণিমার হোম |
| ৭ই ডিসেম্বর | ২১শে | বুধবার | —একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম। |
| ১০ই | ২৪শে | শনিবার | — অমাবস্যার হোম। |
| ১৪ই | ২৮শে | বুধবার | — দুবরাজপুরে অতুলানন্দ মেলার উদ্বোধন |

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।


মডার্ণ ডেকরেটর্স

৩৪ বিবাহ ও যে কোন উৎসবের প্যাণ্ডেল ও গৃহসজ্জায়

৬১এ, ডব্লু, সি, ব্যানার্জী ষ্ট্রীট • কলি-৬ • ফোন- ৫৫-২৫৪৯ ৫৫-৬২৬৫

GRAM DISWASHING

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS

4, Hartford Lane, Calcutta-16

*Works* : 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

**রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ**

বড়বাজার, কলিকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

*MANUFACTURED BY*

**RAMKANAI ELECTRO WORKS**

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

*Phone :*

ফোন : ৩৪-৭২৫৬

**এন্, কে, স্পোর্টস্**

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺রামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

# নারিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

৮৯ বৎসরের

## জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : ৩৫-৪১২৪
৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥
রথীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

# N. G. CHAKRABARTI & CO.

*Manufacturers of* :

Alloy Steel Castings

*SUCH AS*

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
*OF*
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

*Head Office* :
N. G. Chakrabarti & Co.,
3D, Nandy Street,
Calcutta-29
Phone : 42-5197

*Works*
K-65, Howrah Industrial Estate,
P.O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 69-2890

একত্রিংশৎ বর্ষ | তেরশ' চুরাশি | কার্ত্তিক | সপ্তম সংখ্যা

# বিজয়া

শ্রীশ্রীঠাকুর

মার নামেতে বিজয় মোদের
বিজয়া তো নাই
মণি মন্দির মনের মণি
নিত্য মায়ে পাই ॥
ফুলের মত প'ড়ে থাকা
ফুলের মত ঝরা
জীবন মরণ নিয়েই পাবো
চরণ পীঠে ঠাঁই ॥
আঁধার হারা মাকে পেয়ে
আঁধার হ'ল আলা
দীঘল পথে পিছল পথে
সঙ্গী আমার মাই ॥

# ছোটদের সারদামণি

শ্রীঅর্চনাপুরী

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

শুধু কি এই দেহে, স্বপ্নে ধ্যানে সূক্ষ্মদেহে দূর দেশের ছেলেদেরও তিনি কত বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন। বিক্রমপুর কাঁঠালতলী বনদুর্গার মন্দির অনেক দিনের পুরোনো মন্দির। বড় বড় গাছের ডালপালাগুলো মন্দিরের জীর্ণ চূড়াটাকে ছাড়িয়ে চলে গেছে, আকাশ ছুঁই ছুঁই, সেই বনে সূর্যের আলো খুব চুপি চুপি আসে আর চলে যায়। এমনি এক দুপুর বেলায় এই মন্দিরের দুয়ারে একটি ভক্ত খুব কাঁদছে মা মা করে, বনের পাখীরা পরস্পর যেন বলাবলি করে, আহা কার বাছা, কেন কাঁদছে গো? কাঁদছে কি সাধে, সে বড় দুঃখী। সংসারে তার বড় অভাব, তাই তো দেবীর কাছে প্রার্থনা করছে মা একটী যদি উপায় বলে দেন—হঠাৎ সে দেখলো বন আলো করে তার সামনে দাঁড়িয়ে এক দেবী মূর্ত্তি, গেরুয়া কাপড়, হাতে ত্রিশূল, মাথায় এলোচুলের বদলে নেমে এসেছে সাপের মত জটা, 'কে মা তুমি'? মা বলেন, "আমি বনদুর্গা, তুমি কেঁদনা, তোমার দুঃখ দূর হবে।" মা, মা। এত দয়া তোমার। বলেই ভক্তটি কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ল আর দেবীও অদৃশ্য হয়ে গেলেন। দেবীর বরে সত্যিই ভক্তটির দুঃখ দূর হয়েছিল। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য কি জানো, অনেক দিন পরে যখন সে শ্রীমা সারদা দেবীকে প্রথম দর্শন করলো তখন চমকে উঠলো—একি। এঁকেই যে আমি দেখেছিলাম সেই বনদুর্গার রূপে। এ মুখ তো ভুলবার নয়, এ যে মনে আঁকা রয়েছে। ভক্তটি আবার কাঁদতে কাঁদতে মায়ের পায়ে লুটিয়ে পড়লো—আর চিরদিনের মত মায়ের চরণে নিজেকে বিকিয়ে দিল।

শৈলপুরের দেশ হৃষিকেশ, সাধু সন্তদের তপস্যার তীর্থ। সেইখানে তাঁরা কুপড়ি বেঁধে দিন রাত ভগবানের আরাধনায় মগ্ন হয়ে থাকেন। মায়ের এক সন্ন্যাসী ছেলে এসেছেন সেই তীর্থ দর্শন করতে। হঠাৎ শোনেন একটি কুটীর হতে যেন কান্নার সুর ভেসে আসছে। বুক চাপা সেই কান্নার যেন অনেক কথা জমা আছে, ছুটে আসেন সন্ন্যাসী। ঐ তো ঐ কুটীর হতেই তো ভেসে আসছে সুর; দরজায় কান পেতে শোনেন তিনি কে যেন ভাঙা ভাঙা সুরে কাঁদছে আর বলছে, "মা মাগো এখনও তুমি পাঠালেনা"। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়েন সন্ন্যাসী। এসে যা দেখলেন তাতে অবাক হয়ে গেলেন একজন বৃদ্ধা নেপালী সন্ন্যাসিনী একেবারে শেষ অবস্থায় এসে পৌঁছেছেন আর ছটফট করে ঐ কথা বলছেন। কাছে এসে দাঁড়ালেন সন্ন্যাসী। সন্ন্যাসিনী হাঁফাতে হাঁফাতে বললেন, "এসেছ বাবা, এস, তোমাকে পাঠিয়েছেন, আমার আর দেরী নাই।" তারপর একটী পুঁথি দিয়ে বল্লেন, "আমার মৃত্যুর পর এই পুঁথি মুখস্থ করে তিন দিনের দিন এটি গঙ্গায় বিসর্জ্জন দিতে হবে এবং ঐ পুঁথির মন্ত্র কেবল সকলের কল্যাণ কাজেই লাগাতে হবে।" তীর্থ ভ্রমণ শেষ করে সাধু মহারাজ মায়ের কাছে ফিরে এলেন। তখন মা তার সব কথা শুনে বল্লেন, "হ্যাঁ বাবা, ঐ নেপালী সন্ন্যাসিনীকে আমি কথা দিয়েছিলাম যে, তার শেষ সময় আমার একটি ছেলেকে পাঠাবো, তা সে প্রার্থনা তো আমায় পূর্ণ করতেই হবে।" সাধু মহারাজ মনে মনে বুঝতে পারেন যে, তিনি এ ব্যাপার না জানলেও বা মা তাঁকে মুখে যেতে না বল্লেও মায়েরই অন্তরের ইচ্ছায় তিনি গিয়ে পড়েছিলেন ঐ সাধু মা-টীর কাছে। দেখলে তো মায়ের কাছে ঠিক ঠিক প্রার্থনা করলে তিনি ঠিক শুনবেনই শুনবেন।

ঠাকুর বলেছেন মায়ের জন্ম—ও সারদা সরস্বতী। সুরেন্দ্রকুমার নামে স্বামী বিবেকানন্দের এক ভক্ত তিনি দর্শন করেছিলেন মাকে সরস্বতী রূপে। একদিন তিনি স্বামিজীর চরণ তলায় লুটিয়ে পড়ে বল্লেন, "স্বামিজী আপনি আমায় দীক্ষা দিন।" কিন্তু স্বামিজী ধ্যানে যখন জানতে পারলেন যে, তাঁর দীক্ষা হবে স্বয়ং মায়ের কাছে তখন তিনি বল্লেন, "ওরে আমি

তোর গুরু নই তোর গুরু আমার চেয়েও বড়।" সুরেন্দ্রবাবু তো অবাক, "সে কি স্বামিজী! আমরা আপনাকেই জানি বিশ্বজয়ী বলে, আপনার চেয়েও আবার বড় কে আছে এ জগতে?" স্বামিজীর মুখে ফুটে ওঠে সোনার সূর্যের মত এক ঝলক হাসি। বলেন, "আছেন রে আছেন, সময় হলেই তিনি তোকে ডাক দেবেন।" সেদিন আঁধার ঝরা রাত্রি; কালো চালা আকাশের বুকে জ্বলছে এক ঝাঁক জোনাকির মত একরাশ তারা।

সুরেন্দ্রকুমার ঘুমিয়ে আছেন। হঠাৎ তাঁর স্বপ্ন যেন আলোয় আলোময় হয়ে ওঠে। তিনি দেখলেন তিনি শ্রীঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কোলে বসে আছেন আর তাঁর সামনে জ্যোৎস্নার মত সুন্দর এক দেবীমূর্তি আবির্ভূত হয়ে বলছেন, "মন্ত্র নাও" সুরেন্দ্রকুমার আশ্চর্য হয়ে বলেন, "কে তুমি?" দেবী তাঁর বীণার মত কণ্ঠে বলেন, "আমি সরস্বতী। এ মন্ত্র নিলে তুই কবি হবি জ্ঞানী হবি।" তারপর স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তার বহু বৎসর পর যখন তিনি মাকে দর্শন করলেন তখন তিনি যেন চমকে উঠলেন, "একি এই মাকেই তো আমি দেখেছি সরস্বতীরূপে।" তাঁর মুখে আর কথাটি নেই তিনি স্তব্ধ হয়ে শুধু মায়ের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর আর কি, মায়ের কাছেই তাঁর দীক্ষা হ'ল। কি বল, স্বামিজী ঠিকই বলেছিলেন না। কোন ভক্ত মাকে কালীরূপে দর্শন করেছেন, কেউ বগলামূর্ত্তিরূপে কেউ অন্নপূর্ণারূপে; এক কথায় আমাদের বাংলার মেয়ে দারদা মাই ছিলেন জগন্মাতা কালী দুর্গা জগদ্ধাত্রী অন্নপূর্ণা সব।

# ॥ রোদন মৌন ॥

**সুবেন্দু মল্লিক**

মেঘলা বাতাস এলোমেলো মান স্মৃতি
অবহেলা তার অবহেলা মনে পড়ে;
দুচোখে পরম চেতনার বিস্তৃতি
দিলেনা, দিলেনা প্রশান্তি অন্তরে।
ঘরোদূরে চাই নিরানন্দের গ্লানি
মর্মাহতের মূঢ় করে ত্রিয়মাণ;
বৃথা ভুল তবা পূজায়—একথা জানি—

যন্ত্রণা তার হতে পারে অবসান?
আমিতো চাইনা গোপাল তোমার কথা
যা হবে তা হোক আমাতে কি করি ভয়।
চাইনা নিষ্কৃতি চাই না প্রজ্ঞা প্রথা
কে বোঝে অন্য মৃত্যুর সংশয়!
কতো অভিমানি মৃতদেহ যায় বলে
আর ফিরবোনা, দেখো, ঠিক ফিরবোনা;

সব ফিরে আসে প্রিয় জননীর কোলে
কি ব্যাকুল কাঁদে দিবানিশি ওমা ওমা।

আখো ধরিত্রী কি সহিক সুন্দর
পদ্ম কোরকে কথা ওঠে গুঞ্জরি
আখো দীন ঘাসে ধ্যানময় মনোহর
নয়নাভিরাম—কেন যাও বিস্মরি?
এই তো হৃদয় রয়েছে অপেক্ষায়
কি দাম তোমার প্রবিষ্কৃত দুঃখের
যে জানে সে জানে যে চায় সেই তো পায়
মেঘের কিনারে রেখাটি আনন্দের।
গোপাল গোপাল কোথারে গোপাল প্রাণ
কাঁদে উদাসীন তারার উত্তরীয়
তোমার বোণা কি আছে যন্ত্র গান!
রোদন মৌন ভালোবাসাটুকু নিয়ো।

# তপস্বী শ্রীঠাকুর

## শ্রীশরণাপুরা

ফিরে যাই আমরা আবার শিশু সত্যব্রতে···ননী ছানার তুই ছিলেন ব্রজের গোপাল নন্দদুলাল ··কিন্তু যুগ বদলে গেছে। ঘুম ভাঙলেই শিশু মহেন্দ্র দুলালের চাই নবীন মহরার রসগোল্লা···

দুগ্ধপানে বড় তৃপ্তি তার তাই তো বারে বারে ছুটে আসে মাতৃক্রোড়ে···

তারপর বালক সত্যব্রত সদা উৎকর্ণ থাকে ঘুগনীওয়ালার প্রতীক্ষায়···। ঘুগনীওয়ালা এলেই ঠাকুমার আঁচল ধরে টানে পয়সা পাও তবে যাব।

স্নেহের উৎসে ক্ষণে ক্ষণে স্নান করাতে তো পিতামাতা পিতামহী বেশীদিন পাবেন না তাই সত্যব্রতের আবারের অন্ত নেই। সন্ধ্যা হলেই ঘুম ঘুম ভাব করে। বায়না ধরে আদৌও কান্না থামে না কিছুতেই উদ্বেগ—পিতা এসে আদর করবেন খাওয়া হলে গ্লোক বলে ঘুম পাড়াবেন। কোথায় গেলে এমন সোনার গৌর পাবরে।

আরো আছে—নারায়ণের ভোগের জন্য লুচি ভাজা হলেই পঙ্খে পঙ্খে এসে হাজির হয় বলে লুচি খাব। ভোগের জন্য তুলে রেখে দিচ্ছি বলে অভিমানী আর খাবেই না তাই আগেই দিতে হয়।

তবে দুধের গেলাস হাতে নিয়ে ফিরতে হয় তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ওরে আমার সোনা ওরে আমার মানিক কিন্তু ভবী ভুলবার নয় .. শেষে ছকড়া নকড়ার শরণ নিতে হয়···

কিশোর সত্যব্রতের কয়মাস যত দিন আসে বাজার। প্রতিদিন বাজার যাবার সময় স্নেহমুগ্ধ কাকা বলেন কিরে মধ্যম আজ কি আনব? কারণ মধ্যম যে একই আওয়াজ দুবেলা রান্না হলে খায় না বলে ও তো বাসী তরকারী খাব কেন?

প্রতিদিন চাটনী কিনে খাওয়ার জন্য সহপাঠীরা ঠাট্টা করে তাকে বেঙ্গল চাটনী বলে—ছাতুর কচুরী খুবই প্রিয়। হিন্দু স্কুলে কম্পাউণ্ডের ভেতর ভিমের প্রবেশ নিষিদ্ধ···কিন্তু এ যে ব্রতর খুব প্রিয়, তাই তো দেখা যায় কিশোর রেলিঙএর ভেতর দিয়ে মাথা গলিয়ে হাঁ করে—আর বাইরে থেকে ভাগ্যবান ডিমওয়ালা কিশোরের মুখে পুরে দেয় ডিমটী। লুচি ডালমুট বিচুড়ি কি নয়—সবি তার প্রিয়—এক কথায় সমস্ত ভালো জিনিষই তার প্রিয় Me tack every things··· তারপর খেলাধুলা···লেখাপড়া....বীরত্ব কাব্যপ্রীতি স্বদেশপ্রীতি নাটা পিপাসা প্রকৃতি বিভিন্ন বিষয়ে অনুরাগী রসপ্রিয় বিলাসী কিশোর হঠাৎ একদিন উপভোগের গন্ডীকে প্রতিহত করে অন্তরতরকে উপলব্ধি করবার জন্য আত্ম বিশ্লেষণে উদ্বুদ্ধ হলো।

বাস্তব ও সত্যের ··প্রকৃতি ও আত্মার সামঞ্জস্যের জন্য নয় ভগবান লাভের জন্য ভক্তিমার্গ পথে নয় সমাধিলাভের জন্য সে যোগপথ অবলম্বনে দৃঢ়ব্রত হলো—

গীতা মতে শনৈ শনৈ উপরমেত অর্থাৎ সে ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয় রস থেকে আপনাকে গুটাতে লাগলো। প্রথমে তার ভিতিক্ষা এল খাদ্যে ও উত্তম পোষাকে। তাই তো দেখা যায় প্রথমে বাজারের কেনা খাবার পরিত্যাগ···তারপর ঘরের তৈরী মিষ্টান্নদিও ত্যাগ। কিছুদিনের মধ্যে শুধু মিষ্টান্ন নয় সমস্ত রকম উত্তমাহার ও উত্তম শয্যা হল পরিত্যাগ। আই এ পড়ার সময় চলতে থাকে সকলের পরিত্যাজ্য ও অবহেলিত খাদ্য গ্রহণ ও হাতকে উপাধান করে একখানি মাদুর জীর্ণ মাদুরে সুরু হল তার রাত্রিকালিন শয়ন।

কঠোরতা দিন দিন বাড়তেই থাকে। এরপর অনুমাত্র দেহ ধারণের প্রয়োজনে যেটুকু না হলে নয় সেটুকু আহার যেমন বশলা ও তৈলহীন লবনহীন শুধাকে অন্ন···

বি. এ পরীক্ষার পর অন্নও ত্যাগ শুধু শুধাকে একটুখানি মাত্র ডাল সেদ্ধ খেয়ে কলেজ যাত্রা।

তারপর এম এ পাশের খবর যার হলে জীবনবোধ ও মৃত্যুবোধ এই দুইকে সামঞ্জস্য করতে তিনি নির্জনে নিয়তই ধ্যানমগ্ন···

ধ্যান থেকে উঠে থালিতে বসানো যে কোন দুটী একটি আনাজ সেদ্ধা একমাত্র এই আহার···

শীতকালে দেখা যায় ঐটুকু ছাড়াও সোয়াতে রাজী নন কারণ ধ্যানের সময় কমে যাবে যে—তাই দেখা যায় কাঁচা আটা কাঁচা ঘি ও একটা কাঁচা বিলাতি বেগুন কাটিয়ে তাতে মিশিয়ে গলাধকরণ করেই আবার ধ্যানে বসেন।

স্মরণে আসে তাঁর নির্জ্জন নিরন্ন সাধন কুটীরে দিনাতিপাতের কথা—

সুতীব্র অন্ধকার পথে প্রতিদিনই এগারই সময় দেখা যায় একটি শান্ত সংযত কায়ার সঞ্চরণ···তার অঙ্গকান্তিতে সর্ব অন্ধকার যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে যায়—

তারপর সেই জ্যোতির্ময় পুরুষ নীরবে রাস্তার কল থেকে জল নিয়ে প্রবেশ করেন আপনাশ্রয়ে আর খপাটে যায় রুদ্ধ হয়ে যায়···

আপনার অমৃতস্বরূপকে উপলব্ধি করবার জন্য চলে নিরন্তর ধ্যান সাধনা—

একদিনের কথা- সারাদিন ধ্যানের পর ধ্যান থেকে উঠে আহারের জন্য কোন বস্তু ঘরে নেই দেখে ক্লান্ত উপবাসী সত্যব্রত একমুঠো শুকনো মাস কলাই খেয়ে চকচক জল খেয়ে শুয়ে পড়লেন—"কিন্তু মানুষের দেহ তো মনে জাগে প্রচণ্ড অভিমান" কয়েক মুহূর্ত্ত পর সহসা অমৃতের আস্বাদে জিহ্বা বারে বারে আপ্লুত হতে থাকে—। সে যে কি আস্বাদ তুলনা নেই তুলনা নেই—

কিন্তু এ আস্বাদ কোথা থেকে আসে? কেন আসে? এ যে সহস্রার থেকে অমৃত ক্ষরণ হচ্ছে তাই তো তার আস্বাদে মুখ ভরে যাচ্ছে শুধু আস্বাদ নয় ক্ষুধার নিবৃত্তি হয়।

আত্মা তো নিত্য মুক্ত বা নিত্যপূর্ণ তবে সাধনার প্রয়োজন কিসে? সাধনার প্রয়োজন—যে আবরণ আত্মাকে আবরিত করে রেখেছে, পূর্ণ প্রকাশের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে সেই আবরণকে অপসারিত করা।

—আর সেই দিনগুলির কি নির্ম্মম ছবি—ধ্যান থেকে উঠে স্নান সেরে কিছুক্ষণ ভজন করে থালিতে কটী কচু সেদ্ধাতে দিয়ে আবার ধ্যানে বসলেন। কটী কয়েকপর ধ্যান থেকে উঠে দেখেন কচুগুলি পুড়ে গেছে। সে কটীকে জলে ধুয়ে ঘোসা ছাড়াতে ছাড়াতে দেখেন কোনটাই সিদ্ধ হয়নি অথচ পুড়ে গেছে। এটা কি রকম করে হলো? ভালো করে নাড়াচাড়া করতে গিয়ে দেখেন কোনটাই কচু নয় সেগুলি মানের গেড়ো। সবি ঈশ্বরের ইচ্ছা ভেবে খানিক জল খেয়ে বিশ্রাম নিলেন। এমনি ভাবেই কঠোর তপস্যায় কেটে যায় জীবনের চৌদ্দটা বছর।

এরপর মায়ের ইচ্ছায় যখন শ্রীঠাকুরের অনেক সন্তান সন্ততি হলো···সন্ধ্য পড়ে উঠলো তখন ভক্তদের সেবাযত্নে ও উপবাস করে পড়ে থাকার জন্য পুনরায় দুধ নিতে রাজী হয়েছিলেন।

মাত্র কয়েক বছর পর খাদ্য দাড়ালো বেগুন ও শাকসিদ্ধ—কিছুদিন পর শাকটিও উঠে গিয়ে দাঁড়ালো আনাজের মধ্যে শুধু বেগুন সেদ্ধ—তাতে বালিই থাকুক তেঁতোই হোক।

অমৃতলাভ করতে গেলে ইন্দ্রিয়ের প্রতিটি পদক্ষেপকে সুসংযত করতে হবে। ত্যাগ ও তপস্যাই লোকোত্তর পুরুষের জীবন ইতিহাস—

তাই তো শ্রীঠাকুর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত রেখে গেলেন তপস্যার কঠোরতা—

# কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ

**স্বামী বোধানন্দ**

"কলৌ জাগ্রতী কালী—কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ"।—এই মন্ত্রে বিশ্বজননী আর সেই বিরাট শিশুর উদ্বোধন। যুগতীর্থ দক্ষিণেশ্বরে এই মহামন্ত্র মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণে।

সকল ভাব-অভাব, সকল রূপ-অরূপ, সকল মত ও পথ—বিশ্বের সকল ধর্মসাধনার সিদ্ধিলাভ করিয়া—"মাতৃভাব—সাধনার শেষ কথা"—এই মহাবাণী শ্রীরামকৃষ্ণ দিয়া গিয়াছেন। ...বিশ্বজননীর ভাবমূর্ত্তিতাকার শ্রীরামকৃষ্ণ। কামারপুর উদ্যান বাটিতে তাঁহার তিরোভাবের অব্যবহিত পরে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবী আকুল চীৎকারে ক্রন্দন করিয়া উঠিয়াছিলেন—"ওগো মা কালী গো! তুই কোথায় গেলি গো!"—আবার স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছেন—"শাক্ত শব্দের অর্থ জান? শাক্ত মানে, যিনি ঈশ্বরকে সমস্ত জগতে বিরাজিত মহাশক্তি ব'লে জানেন এবং সমগ্র স্ত্রী জাতিতে সেই মহাশক্তির বিকাশ দেখেন। মাতৃপদই জগতের শ্রেষ্ঠ পদ। ভগবান বল, অবতার বল, রামকৃষ্ণ ছিলেন আমাদের মা ·····জয় মা জয় মা!" ত্যাগব্রতী অন্তরঙ্গ সন্তানেরা শ্রীরামকৃষ্ণের মাতৃস্বরূপ উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাই দেখি—মাতৃভাবমূর্ত্তিতা যশোদার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার মানসপুত্র রাখালকে স্তন্যপান করাইতেছেন; মাতৃভাবের আবেশে ব্রজের রাখালকে কোলে বসাইয়া ক্ষীর ননী খাওয়াইতেছেন। ....তারপর কিঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হইয়া বলিতেছেন—"রাখালকে দেখে উদ্দীপন কেন হয়? যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশ্বর্য্যের ভাগ কম পড়ে যাবে। সাধকের প্রথম দর্শন হয় দশভুজা ঐশ্বরী মূর্ত্তি। সে মূর্ত্তিতে ঐশ্বর্য্যের পূর্ণ প্রকাশ। তারপর দর্শন ষড়ভুজা, তখন দশহাত নাই—অত অস্ত্র শস্ত্র নাই। তারপর গোপাল মূর্ত্তি দর্শন, কোনও ঐশ্বর্য্য নাই, কেবল কাচ্চেলের মূর্ত্তি।....(কথামৃত,)।"

আবার, জগজ্জননীর মানসপুত্র শ্রীরামকৃষ্ণ। মায়ের দুলাল মায়ের কোলে মায়ের আদরে গরগর। মাতৃস্নেহের সেই অমৃতধারায় বিশ্বের সকল সন্তানের তৃষিত হৃদয় সিক্ত করিবার জন্য তিনি তাহাদের দুইবাহু, আবেগাকুল কণ্ঠে বলিতেছেন—"আমার মা চাই! আমি যে ছেলে—জয় তরাসে! বালকের মা চাই না? তাই তুমি মা আমি ছেলে! মার ছেলে মাকে ছেড়ে কেমন ক'রে থাকে?"...

সমাজ সংসারের চারিদিকে পুঞ্জীভূত আবর্জ্জনার পঙ্কিল, ঘোর ইন্দ্রিয়াসক্তির বিষময় প্রতিক্রিয়ার জ্বালায় জর্জ্জরিত মানুষের চিত্তকে শান্তির চন্দনে সিক্ত করিবার জন্য প্রয়োজন আজ—মাতৃহৃদয়ের, যাঁহার বক্ষ আশ্রয়ে ক্লান্ত, ভয়ার্ত্ত, অসহায় মানব সান্ত্বনা ও সাহস পাইয়া, বাসনার দহন জ্বালা ভুলিয়া শুদ্ধ সন্তানভাবের মিগ্ধতায় শান্তির নিঃশ্বাস ফেলিবে।—

.....সকল কথা ছেলে ভোলে
টেনে যখন নেয় মা কোলে
মায়ের কোলে আঁখির পাতা
জড়িয়ে আসে মা মা বোলে।
অসহায়ের শরণ ব'লে
তাইত আমি এলেম চ'লে
চোখের জলে বুকের তলে
এবার জুড়াবো মা সকল জ্বালা।"

(সত্যানন্দ)

• • •

যুগপ্রয়োজনে নরদেবগণ ঐশীশক্তির প্রেরণায় তাঁহাদের জীবন সাধনার মধ্য দিয়া মানুষকে অধ্যাত্ম পথের সন্ধান দিতে আসেন।·····কলৌ জাগ্রতী কালী—কলৌ জাগর্ত্তি গোপালঃ"—এই মন্ত্র রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল শ্রীরামকৃষ্ণের

আর এক মহাশক্তিধর জ্যোতির্ময় পুরুষের জীবনে। তাঁহার নাম শ্রীসত্যানন্দদেব। তিনি তদধীন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যের প্রধান সহচর বীরভদ্রের অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বংশের সহিত যোগসূত্রে বিধৃত। বর্তমান ভারতের উচ্চকোটির অধ্যাত্মপুরুষ ও সিদ্ধাসাধিকাদের মধ্যে অনেকেই তাঁহাকে আধিকারিক পুরুষরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন। ....আজ হইতে প্রায় ৫০।৬০ বৎসর পূর্বে কলিকাতার কাশীপুর বাটি "ছায়াবীথি"তে ও বীরভূমের সিউড়ী সহরের এক নিরালা পল্লীর গৃহকোণে অন্তরঙ্গ সাধনার ইতিহাস এই আত্মপ্রচার বিমুখ সাধক গোপন রাখিতেন। তবে, অতি আন্তরিক ভাবে প্রার্থনা করিলে ক্বচিৎ কখনও বলিতেন— "আমার জীবনের সাধনার কথা বলতে গেলে বলতে হয় আমি প্রথমে অদ্বৈতে বিশ্বাসী ছিলাম—ক্রমে ধীরে ধীরে অদ্বৈত হ'তে দ্বৈত ভাব আসে—সে সময় ধ্যান করতে বসে এই রকমটা মনে হ'ত যেন একটা কমল কুঁড়ি নীচের থেকে উপর দিকে যাচ্ছে—ক্রমে ক্রমে সেটা সহস্রারে গিয়ে উঠলো আর একটি একটি ক'রে পাপড়ি খুলতে লাগলো—সমস্ত পাপড়িগুলি খুললে মন টুপ ক'রে সেই কোটা পদ্মের মাঝে ডুবে যেত—তখন সমস্ত স্থির নিথর। তারপর ক্রমশঃ মা এসে বাসা বাঁধলেন। আবার এই রকমে যেতে যেতে কেমন ক'রে যে ঠাকুর এলেন জানি না; এক রকম হঠাৎ এসে জুড়ে বসলেন - সে এক বিরাট কৃপা।".... আহার নিদ্রা ভুলিয়া মায়ের সাক্ষাৎ দর্শন লাভের জন্য তাঁহার ব্যাকুলতার কথা কোন শুভ মুহূর্তে কৃপা করিয়া কিছু কিছু বলিতেন। প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা কখনও অতি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিতেন তাঁহার 'ডায়েরী'তে। পরে প্রায় সব 'ডায়েরী' তিনি নিজ হাতে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ১৯৪১ সালে সিউড়ীতে আশ্রম জীবনের প্রথম অধ্যায়ের দিনগুলিতে আমরা যখন তাঁহার নিবিড় সান্নিধ্যে থাকিতাম, তখন হঠাৎ দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল একটি মাত্র ডায়েরীতে তাঁহার নিজ হাতে লাল কালিতে লেখা এই কয়টি কথা—"Dancing with the Mother !"... সেই ডায়েরীটিও শেষে তিনি অগ্নিসাৎ করিলেন।...চিন্তামণির নাচদুয়ারে এইরূপ কত মণিই যে ছিল, সেইসব মণির সন্ধান আর কোনদিন পাওয়া যাইবে না। তবে, তাঁহার মাতৃদর্শনের রূপ বর্ণনা করিয়াছেন তিনি কোন কোন সঙ্গীতের মাধ্যমে। শুধু বুদ্ধির দ্বারা তাঁহার এই সঙ্গীতের ব্যাখ্যা করিতে পারিব কি? শুধু কথার জাল বুনিয়া মায়ের এই রূপ ধরিয়া রাখিতে পারিব কি? তিনি যে রূপ সাগরের অতলান্তে ডুব দিয়া প্রেম-রতন পাইয়াছিলেন!—

"একি অপরূপ রূপ হেরি
সমাধি সায়র মাঝি
উঠিলে কালবরণ ধরি
গগনেরি মাঝে
বিজলী বিরাজে
আলোছায়া সব
লুকালো যে লাজে
অনন্ত দায়রে অনন্ত বিকাশ হেরি
কলকে কলকে মাঝে কিরীট কুণ্ডল
চমকে চপলা নয়ন চপল,
শব শিব হ'ল পদতলে পড়ি'।
এলায়ে পড়েছে আকুল কুন্তল
পদতলে বেরা করে টলমল
হেরে টলটল রূপমাধুরী।
রক্তজবা গলে পায়ে রক্তজবা
রক্তেতে রক্তেছে শ্রীঅঙ্গের শোভা
হাসে খলখল শ্মশান সুন্দরী। সত্যানন্দ

মায়ের ঐ "টলটল রূপমাধুরী" কিন্তু সন্তানের অন্তরে ভয়মিশ্রিত ভক্তির সঞ্চার করে; আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছুটিয়া গিয়া সন্তান মায়ের বুকখানি জড়াইয়া ধরিতে সাহস পায় না। কারণ, মা যে 'শ্মশান সুন্দরী!' মায়ের শ্রীঅঙ্গ যে 'রক্তেতে রক্তেছে!' মুখে যে 'খলখল হাসি!' 'চপল নয়নে' যে 'চপলা চমকে!'...

মা করালী, আবার কল্যাণী। সন্তান কল্যাণী মায়ের মাঝে আশ্রয়দাতা হইতে চায়। তাহার শান্তরূপা জননীর অঙ্গে শতচন্দ্রের উজ্জ্বল জ্যোছনা। শরতের শুভ্র চন্দ্রটীকা তাঁহার সুন্দর ললাটে। শত তারার মালা তাঁহার গলে

বিশ্বরূপশ্রীবর্ত্তিতা রাজরাজেশ্বরী জননীর অঙ্কের জ্যোতির্ধারা যেন বিগলিত করুণা।···

—"সৌম্য হ'তে সৌম্যতরা
রূপে অরূপ রূপধরা
ওমা তুই বিশ্বরূপের রাণী।
তুমি শান্তি তুমি কান্তি
সুখ দুখ মোহ ভ্রান্তি
কল্যাণী ও কল্যাণী।

শত চাঁদের সোহাগ নিঙড়ে ঘ'রে
ঐ রূপের জোয়ার ঠিকরে পড়ে
মায়ের আশিষখানি।
শরৎ চাঁদের টিপটী দোলে
শত তারার মালা গলে
এলি রূপের সায়র ছানি। ( সত্যানন্দ )

মায়ের ভুবন ভুলানো রূপের মাঝে একাকার শ্রীসত্যানন্দ আপনিই হইয়াছিলেন মা।···আবার, মাকে পাইয়া, শয়নে স্বপনে নিদ্রা জাগরণে মায়ের সাথে সাথে থাকিয়া, মায়ের সঙ্গে হাসিয়া খেলিয়া নাচিয়া, তিনি মায়ের আলোর দুলাল হইয়াছিলেন।···একাধারে মা আর ছেলে।- সেই জন্যই তো, তাঁহার মাতৃস্নেহের যে অমৃতদীপ তিনি জ্বালাইয়াছিলেন—কতছেলে আর ছোট ছোট মেয়েরা সেই অমৃত দীপের শিখায় কাঁপ দিয়াছিল। সেই জন্যেই তো, দিব্য শিশু সত্যানন্দ সুন্দরের অপার্থিব আকর্ষণে মায়েরা বাৎসল্যের সুধারসে ভরপুর করিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়াছিলেন নিঃসঙ্কোচে।

মাতৃজাতিকে কতখানি শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে হয়, যাঁহারা আশ্রমে তাঁহার নিকটে আসিয়াছেন, দীর্ঘকাল তাঁহার নিবিড় সঙ্গলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন। জগন্মাতার চরণে অনাঘ্রাত কুসুমের মতো না হইলে ঠিক এমনটি হওয়া যায় না। জগতের সকল নারীকে জগজ্জননীর এক একটি রূপে না দেখিলে, গোপালের দিব্য-সত্তায় প্রতিষ্ঠিত না হইলে সারাজীবনের প্রতিটি মুহূর্তে এইরূপ আচরণ করা যায় না। অবিশ্বাস আর বিষাদ সংসারের এই ফুলে শুধু কথায় ইহা বুঝানো যায় না। জীবনের হাতিপাল্লা ঠিক করিয়া আগাইয়া আসা চাই—তবেই।····

এই সংসারে দৈনন্দিন জীবনের সকল কর্মের মাঝে থাকিয়াও, ইহা হইতে বহু উর্ধ্বে এক আনন্দময় লোকে – গোপাল লোকে তাঁহার সত্তা অহরহ বিরাজ করিত। কখনও বালগম্ভীরভাবে মুগ্ধ আবেশে তাঁহার শ্রীমুখখানি আরও শান্ত মধুর। কখনও ঐ শিশু সুন্দরের চম্পিম মুখে উজ্জ্বল হাসি।···আবার গোপালের লীলাসখী সত্যানন্দ সুন্দর আশ্রমের জাগ্রত বিগ্রহ গোপালজীর ভোগরাগে, সাজ-সজ্জায়, আদরে আব্দারে মধুর অভিমানে—মধুর হইতে আরও মধুর গোপাল-লীলায় ভরপুর।

( ক্রমশঃ )

# দ্বারাবতীর ডাক

**শ্রীযোগমায়া**

মধ্যাহ্নের দীপ্ত আলোর মাঝে বৃন্দাবনে যেন থেমে ওঠে আকাশ বাতাস ব্যাকুল করা শ্যামলীয়ার সুরের বাঁশরী। ঘুম না আসা বেলা, তাই দুজন মাঝে রাখিয়ে নি সুরের পরশ। কুঞ্জবনের মন্দির আনার সঙ্কেত নিয়ে না আসা চোখে বেলা তিনটে থেকে আমরা বলতে সুরু করি এবার চল মন্দিরে। মন্টুকে টাকা নিয়ে আসার কথা বলি। আমাদের ব্যস্ততা দেখে সতীমাও বলেন, হ্যাঁ অনেক খানি পথ ফিরে আসতেও দেরী হবে। তারপর তাড়াতাড়ি রোদে চা তৈরী করে দিলেন। ওদিকে মন্টুবাবু সেই ছোট ব্রজ বালকটির সঙ্গে টাকা নিয়ে এসে হাজির। সকলেই খুব উৎসুক। ব্রজের পথে পদব্রজে যাবার ইচ্ছা থাকলেও আরাধনাদির হাই প্রেসারের জন্য টাকার ব্যবস্থা করতে হোল। তাছাড়া মন্টু ও শঙ্কুবাবুর আপত্তি কিনতে রাত্রি হবে, এ রাস্তায় মায়েদের টাকা করেই যাওয়া ভালো।

সুরভি ছড়ানো কুসুমকীর্ণ পথগুলি থেকে দেখি সবুজ স্নিগ্ধ শিরাসী নয়নে চেয়ে আছে কৃষ্ণকান্তের ব্যাকুল প্রতীক্ষায়। এই বনেই তো হয়েছে কত মধুর ব্রজলীলা। বিরাট প্রসাদের মাঝে কুঞ্জবনের মন্দিরগুলি আজ মহিমায় গরিমায় হয়ে রয়েছে। প্রথমেই আমরা ঢুকলাম কাত্যায়নী মন্দিরে। সোনার মূর্তি দশভূজা। মন্দিরও তেমনি সুন্দর। শান্ত পরিবেশ, সকলে কিছুক্ষণ বসে ধ্যান করলাম আর গানও শোনালাম কাত্যায়নী দেবীকে। 'ওর জয় জননী'। এইখানেই তো গোপীদের পূজা সিদ্ধ হয়েছিলো। মন্দিরের চারদিকে বাগিচা বেশ সাজানো। মাঝে মাঝে মিষ্টি পাখির সুর। এমন সময় একটা ঝুপ করে আওয়াজ হলো, সকলেই এগিয়ে এসে উৎসুক হয়ে তাকাই। শ্রীতামা বলে ওঠে ঐ দেখুন যোগমায়া মা বসুর। আমরা নিস্তব্ধ প্রাঙ্গণে হেসে উঠি। বলি কট বসুর। একটু দেখা দিয়ে কোথায় লুকিয়ে গেল তাকে স্মরণ করে আমাদের সঙ্গে এসেছিলো গান গাইতে।—

আবার চলি পথ, অপরাহ্নের মিঠে আলো আরও রং তুলিকা দিয়ে আঁকে আকাশের পটখানি তার বুকে যেন মিলিয়ে রয়েছে, নীলমণির রাঙা হাসি পদ্মরাগ মণিকে বুকে ধরে ভরিয়ে দিয়েছে সোহাগী চুমায়, সুধা যেন ধীরে ধীরে তারই বুকে মিলিয়ে যায়। আমরা যমুনা কিনারে বসে দেখি ওপরের ছবি। ছোট্ট একটি তরী এসে আমাদের ঘাট দিয়ে পেরিয়ে যায়, মনে হয় নীলছেলে যেন আমাদের নিতে এসেছে। একটি নীরব ধ্যান যেন প্রহর কেটে গেলো।

কিছুক্ষণ মধ্যে ব্রজ বালকটি যমুনার একটি ঘাটে নিয়ে এসে বললো, এটি চীরঘাট, এই গাছে কোন মানসিক সফল হলে সব ছোট্ট কাপড় বেঁধে দিয়ে যায়। যমুনার তীরে বাঁধানো বেদী মাঝে বিরাট বৃক্ষ, ঘন পাতায় ঢাকা ছোট্ট ছোট্ট রঙীন কাপড়ও বাঁধা রয়েছে। আমরা কাছে গিয়ে প্রণাম করলাম। সুমনাদি বলেন এটিকে বস্ত্র হরণ ঘাট বলে ওদিকে যমুনার জলে দূর থেকে দেখা যায় খুব মোটা মোটা শিকল দিয়ে বাঁধা বয়া। শুনলাম কুম্ভ মেলায় সাধুদের ওখানে খুব ভীড় হয়। কিছুদূর এগিয়ে যমুনার কিনারে মাঝে দেখি কালীয় নাগ বিশাল রূপ ধারণ করে ফণা তুলে আছেন আর বালক কৃষ্ণ তার উপরে চড়ে বাঁশী বাজাচ্ছেন, বিশ্বম্ভরের সবই সম্ভব এই বলে প্রণাম করে সেখান থেকে চলে এলাম।

ব্রজ বালকটিকে বলি আগে আমাদের দুজ গুলি দর্শন করিয়ে দে, একমুখ হেসে বলে হিন্দিতে,—হাঁ ঠিক নিয়ে যাবো সন্ধ্যা হবার পূর্বে। সে জানে সন্ধ্যার পর গেলে বনগুলিতে ঢোকা যাবেনা বিশেষ করে নিকুঞ্জ বনে বৃন্দাবনে প্রথমে ঢুকবার সময়:থেকেই এই বালকটি সঙ্গ নিয়েছে। আমরা তাকে বলেছি তোর সবকিছু চেনা জানা আছে, আমাদের সঙ্গেই থাকবি। সে ঠিক কথামত কাজটি করে যাচ্ছে, আমরা টাঙ্গায় চড়ে মাঝে মাঝে গল্প করে তার সঙ্গে বেশ আনন্দ পাই। কিছুক্ষণের মধ্যে ঘন ঘন আমরা টাঙ্গা থেকে নেমে সবুজ বনভূমিতে প্রবেশ করি। এখানকার গাছগুলিও

অদ্ভুত ধরণের নরম হয়ে যেন কৃষ্ণের পূজার মত। বনের মাঝে ঢুকতেই দেখি সারি সারি দল বেঁধে ময়ূর ময়ূরী এগিয়ে আসে বানর, আমরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাই। স্থানীয়রা বলেন,—আপনারা রাধে রাধে বলুন আপনি সরে যাবে। সকলে মিলে জয় রাধে জয় রাধে বলে প্রবেশ করলাম, গাছের তলাগুলি পর্যন্ত অদ্ভুত ধরণের পরিষ্কার একটি পাতা পর্যন্ত পড়ে নেই। আমরা একটি ছোট মন্দিরে ঢুকলাম একটি সুন্দর পালঙ্কে শয্যাপাতা চারিদিকে ফুল ছড়ানো শুনলাম এটি নিধুবন। বন থেকে বেরিয়ে আসতেই দরজার দুপাশে বসে আছে তেলেভাজা ছোলাভাজার ঝুরি নিয়ে মেয়েরা, বালকেরা, সেইগুলি কিনে বাঁদরদের দিতে হয়। আমরা সেখান থেকে বেড়িয়ে এসে পথ চলতে চলতে সামনেই একটি মন্দিরে প্রবেশ করে দেখি বহু তীর্থ দর্শনার্থী হাত জোর করে বসে পাঠ শ্রবণ করছে, সকলে একটু ভীড় ঠেলে প্রণামী দিয়ে চলে এলাম পাঠক ঠাকুর মাঝে মাঝে বলেন দেবকী বাসুদেব কৃষ্ণ বলরাম এই বেশমূর্তি দর্শন করলে চারধামের তীর্থ দর্শনের পুণ্য হয় ইত্যাদি।

এবার আমরা অধীর হয়ে পড়ি আর ব্রজ বালকটিকে বলি তাড়াতাড়ি নিয়ে চল নিকুঞ্জ বনে ঐ দেখ সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সে বলে,—না না ঠিক দর্শন হয়ে যাবে। তাকিয়ে দেখি দিনের আলোও যেন আমাদের পথ চলার ছন্দে মিলিয়ে চলেছে। টাঙ্গা থেকে দেখি নাটমন্দিরের মত বিরাট জায়গায় ছোট্ট ছেলেমেয়েরা কৃষ্ণ রাধা সেজে রাসলীলা নৃত্য করছে। আমরা সেই পথ পার হয়ে নিকুঞ্জবনের পথ ধরলাম। ব্রজ বালকটি মাঝে মাঝে বলে যায় নিকুঞ্জবনের কাহিনী আমরাও রসিয়ে রসিয়ে প্রশ্ন করে শুনি মজা করে, সে বলে যায় সন্ধ্যার পর ঐ বনে কেউ থাকতে পায় না। রাতের শিপড়েটি পর্যন্ত দল বেঁধে সারি সারি চলে যায় বন থেকে। সুমনাদি বলেন,—তাই নাকি ওখানে কি আছে। বালকটি বলে চলে ওখানে কৃষ্ণ রাধাজী, আর সব গোপীরা কৃষ্ণের পদসেবা করেন। ছোট্ট বালকের মুখে ভাঙ্গা ভাঙ্গা মিষ্টি কথাগুলি শুনতে খুব ভালো লাগছিলো। এবার আমাদের টাঙ্গা এসে দাঁড়ালো নিকুঞ্জ বনের সামনে। সকলে বনের মধ্যে প্রবেশ করি। চারিদিকে ছড়িয়ে রয়েছে ভীষণ নির্জনতার মাঝে গভীর নিস্তব্ধতা। গোধূলি আলোর উত্তরীয়তে ধন সবুজ বনভূমি হয়ে উঠেছে শ্যাম কমল। আমরা গুন গুন করে গান গাইতে গাইতে চারিদিকে ঘুরে ফিরে দেখতে লাগলাম। সামনে রাসস্থলী জায়গাটি আকারে বড় বনের আরও গভীরে গিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করলাম। চাঁদের নক্সা ঢালার মত কৃষ্ণকে ঘিরে বসে আছেন প্রিয় সখীবৃন্দ। নিভৃত মন্দির থেকে বেড়িয়ে এল একটুকরো আলো, মনে হোল চির চেনা ধনের অদ্ভুত স্পর্শ, নিবিড় আনন্দে মনটা ভরে উঠলো, গৈরিক সাথীদের ভগবানের কৃপা করলাই সফল। মনে মনে গেয়ে ওঠি গান, "মোর জনম জনম কে সাথি" আর একটি গানের সুরে রাখিয়ে দিই "দেখ দেখ কানহা রাসকী রাতিয়া"। সকলে কৃষ্ণজীকে গানের মালা নিবেদন করে জানাই তুমি যেন ভুলে যেও না হাত ধরে থেকো। প্রাণের প্রণতি জানিয়ে সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। গাছের ছায়া নেমে আসছে দেখে পুরোহিতরা ফিরে যেতে বলেন, আমরা চলতে শুরু করি। বনের মধ্যে সারি সারি বাঁদরগুলিও দেখি গাছ থেকে নেমে বন থেকে বেরিয়ে এল।

সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটী নিয়ে এলো আমাদের ললিতা কুণ্ডের কাছে। বহু এখানে কৃষ্ণ ভগবান বেড়াতে এসেছিলেন এমন সময় ললিতা সখীর খুব জলতেষ্টা পায় তাই তীর দিয়ে কূপ খনন করে জল বার করেন, এখানটী সেই থেকে ললিতা কুণ্ড বলে পরিচিত। আরও কিছুদূর এগিয়ে এসে যে তমাল বৃক্ষটিতে কৃষ্ণজী বাঁশী বেরে গান গেয়েছিলেন আমরা সেখানটিতে হাত দিয়ে প্রণাম করলাম গাছটাতে দেখি অসংখ্য শালগ্রাম শিলা যেন গাঁথা সকলে দেখে অবাক হলাম, গাছের ভেতর গভীর গর্তের মধ্যে জল রয়েছে তারমধ্যে গোপাল দক্ষিণা দিয়ে প্রার্থনা জানলে মনবাসনা পূর্ণ হয়। যাত্রীরা দলে দলে ভীড় জমাচ্ছে, আমরা সেখান থেকে বেড়িয়ে মদনমোহনের মন্দির পথে চলতে শুরু করলাম।

টাঙ্গার চড়ে আলো আঁধারির পথধানি পার হয়ে এলাম মদনমোহনের মন্দিরে। অন্দরে প্রবেশ করি, দৈর্ঘ্যতায় উচ্চতায় বেশ বড়, দেখে মনে হোল অনেক দিনের পুরাতন মন্দির, টিম টিম করে জ্বলছে ইলেকট্রিক আলো। দূরে বসে একটি বৈষ্ণব ভক্ত চৈতন্য লীলা পাঠ করছেন, মন্দিরে এগিয়ে এসে প্রণাম করলাম। মদনমোহনের শ্রীমুখে করে পড়ছে অমিয় হাসি, আর একটী সিংহাসনে রয়েছেন দুবাহু মেলে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ, আমরা বোলাম মহাপ্রভু বেশ অভিনব কোট পড়েছেন। দেখে আনন্দ হোল, পুরোহিত বল্লেন মা এবার ঠাণ্ডা পড়ছে তো তাই এই পোষাক। সকলে মিলে গোপী গীতা সুর করে শোনালাম, ফিরতি পথে জিজ্ঞেস করি এখান থেকে সনাতন মন্দির কতদূর? তাঁরা বল্লেন এখন কি আপনারা যেতে পারবেন? রাস্তাটা খারাপ রাত্রিও হয়ে গেছে। আমরা বলি কাছে যদি হয় তবে যাবো। পুরোহিত বল্লেন না মা দূর নয় একটু গলি গলি উঁচু নীচু পথ পেরিয়ে গিয়ে মন্দির। আমরা এগিয়ে চলি। স্বচ্ছ চাঁদের আলোয় পথটার মাধুর্য্য আরও বাড়িয়ে তুলেছে। সতীমা বল্লেন,—ওই দেখ যমুনা। আমরা চেয়ে দেখি একটু দূরে বিরহী যমুনাকে চাঁদ যামন এসে চুপি চুপি পরিয়ে দিয়েছে একছড়া স্বর্ণমালা। শ্যাম সোহাগী যমুনা তাই বয়ে চলে আপন ছন্দে। আমরা সেখানটা পার হয়ে যমুনার তীরের উপর ছোট্ট একটী মন্দিরের সামনে এলাম, কয়েকটী বৈষ্ণব ছিলেন তাঁরা উঠে দাঁড়ালেন, একজন বসে চৈতন্য চরিতামৃত পাঠ করছেন। একজন খুব উৎসুক হয়ে বল্লেন আপনারা সবাই মন্দিরে বসুন। কাছে গিয়ে সকলে প্রণাম করলাম। ভেতরে সনাতনের মদনমোহন বাঁশী হাতে করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। সতীমা বল্লেন আমরা যখন আগে এসেছিলাম ছোট্ট একটা খড়ের ঘর ছিলো এখন বেশ পাকা মন্দির হয়েছে। একজন বসে যেতে লাগলেন সনাতন গোস্বামী ও মদনমোহনের লীলা কাহিনী। তারপর দুনের জাহাজের গল্পটী বলাতে আমরা বললাম আমাদের গুরুদেব স্বামী সত্যানন্দ এই গল্পটী ভক্তদের কাছে খুব বলতেন। মদনমোহনের মন্দির দেখে খুব আশ্বাস হোলাম, এবার যাকে বিহারীর মন্দির যেতে হবে, মদনমোহনের আর বৈষ্ণবদের সেবার মন্ত্রে প্রণামী দিয়ে সেখান থেকে চলে এলাম।

মন্দিরে মন্দিরে বেজে ওঠে সন্ধ্যার কাঁসর ঘন্টার ধ্বনি। আমরা প্রাসাদের মত একটী মন্দিরে প্রবেশ করলাম। চত্বরে প্রচুর ফুলমালা, ফল, মিষ্টির দোকান। আমরা দুটী লাল গোলাপ আর গাঁদা ফুলের মালা হাতে করে যাকে বিহারীর সামনে দাঁড়ালাম। সেখানে দেখি অনেক ব্রজবাসী ও দর্শনার্থী রাধাকৃষ্ণের নাম গানে উন্মত্ত। সকলেই অপেক্ষা করছে মন্দির দ্বার খোলার। এমন সময় দেখি সবুজ উত্তরীয়র সাথে সোনার চাঁদের লুকোচুরি খেলা। কিন্তু করে একটু হেসে চাঁদ বুঝি লুকিয়ে পড়লেন। আবার তক্ষুনি পর্দাখানা সরে যায়। দেখি যাকে বিহারীর, রাধা কৃষ্ণের মিলনরূপ। হৃদয় বীণায় যেন বেজে ওঠে সুর "ওগো সুন্দর মরি মরি"।

কি দিয়ে তোমায় বরণ করি। কাজল যেন এসেছে কাছে তাই অমৃত স্বাদ জাগলো ভক্তের হৃদয়ে। যাকে বিহারীর বাঁকা দর্শনটী দেখতে বেশ মজা লাগলো। আমরা একটু বিশেষ কৃপা উপলব্ধি করে সেখান থেকে ফিরে এলাম।

রাত্রি বেশ হয়ে গেছে বাজারের পথ দিয়ে চলেছি। সকলেই বলি কালতো মথুরা যাওয়ার কথা; কোলকাতা আশ্রমের বিগ্রহদের জন্যে কিছু জিনিষ কিনে নেওয়া ভালো। শম্ভুবাবু টাঙ্গা থামালেন। সকলে মিলে জিনিষ পছন্দ করে কিনে আবার টাঙ্গায় উঠে পড়লাম।

নিজেদের ডেরায় ফিরে সুরু হল খঞ্জনীর কথা। বৃন্দাবন ধাম দর্শন করে সকলেই পরিতৃপ্ত। রাত্রে আহার করবার কথাও কারো মনে নেই, ঘড়িতে অনেক বেজে গেছে, ছেলেদের জন্যে পুরি তরকারী কিনে নিয়ে আসা হোল, আমরা একটু দুধ ও সামান্য কিছু খেয়ে রাতের আহার শেষ করে ঘুমিয়ে পড়লাম না মোহনীয়ার সুরচ্ছন্দে জেগে রইলাম। প্রচ্ছন্ন হয়ে কি আজও বৃন্দার সেই রাধা মাধবের বিরহ মিলনের সুর, পৃথিবীতে আনে তাঁর বেণুকা সুরের কল্যাণ ধারা। কদম্বকেলীতলে যমুনার পুণ্য তোয়ায় কি ভেসে আসে সেই মিঠে সুরের সঙ্কেত আলাপ।

"নাম সঙ্কেতং কুত সঙ্কেতং বাদয়তে মৃদু বেণুম্"

কেটে গেলো একটী ধ্যান গহিন সুন্দর রাত্রি—

(ক্রমশঃ)

# গীতা বনাম ভাগবত

আলোচনা : শ্রীপুষ্পিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, ভাগবতরত্ন

অনুলিখন : স্বামী হীরানন্দ

এবার জুলাই মাসে যাদবপুরে "শ্রীসত্যানন্দ দেবায়তনে"র দ্বিতীয় বার্ষিক প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব উপলক্ষে আমাদের সঙ্ঘপতি পূজনীয় স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজ ও পূজনীয়া শ্রীঅর্চনা মা এসেছিলেন দেবায়তনে। সে সময় একদিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর পূর্বাশ্রমের অগ্রজপ্রতিম অভিন্নহৃদয় বন্ধু শ্রীপুষ্পিতা রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় দেবায়তনে করেন শুভাগমন। সেদিনের সান্ধ্য সৎসঙ্গে তিনি স্বামীজী ও যাদবপুরের ভক্তদের অনুরোধে গীতা ও ভাগবত নিয়ে তুলনামূলক অপূর্ব আলোচনা করে সকলকে অশেষ আনন্দ দেন। তাঁর সেই মধুর ভাষণের একটু এখানে ভাবমুখের পাঠকদের জন্য ধরে দিলাম।

গীতার দুটি মূল কথা। একটি হচ্ছে সমস্ত জগত ব্যেপে তিনিই সব কিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন। তিনিই সব। God is a great circle whose centre is everywhere but circumference is nowhere—ভগবান একটী বড় বৃত্ত যার কেন্দ্র (centre) সর্বত্র কিন্তু পরিধি (circumference) কোথাও নেই। গীতায় ভগবান অর্জুনকে উপদেশ দিচ্ছেন যুদ্ধের পটভূমিতে। কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে দুপক্ষের সৈন্য সমবেত হয়েছে। চতুর্দিকে ভেরি শঙ্খ নিনাদ হচ্ছে—হৈ-হৈ ব্যাপার। এই পরিবেশে অর্জুনকে ভগবান উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুন বিষাদগ্রস্ত হয়েছেন। যুদ্ধ করবেন না। অনেক বড় বড় কথা বলছেন। অর্জুন তো গোড়ায় জানতেন না শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। জানতেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মামাতো পিসতুতো ভাই হন। তাই কৃষ্ণ যখন বললেন অর্জুনকে "তোমাকে যে সব কথা বললাম তা নতুন নয়, ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্/বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ।" আমি এই অবায় যোগ সূর্যকে বলেছিলাম, সূর্য মনুকে বলেছিলেন, মনু ইক্ষ্বাকুকে বলেছিলেন, কালপ্রবাহে সে সব নষ্ট হয়ে গেছে, তাই তোমাকে আবার বললাম"; অর্জুন তখন থামিয়ে দিলেন শ্রীকৃষ্ণকে। বললেন, তুমি সূর্যকে আগে বলেছো বলছো, কিন্তু তোমার জন্ম তো সূর্যের অনেক পরে। অর্জুনের কথায় ফাঁক আছে। তখন কৃষ্ণ বলছেন, বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন। তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ। অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া। —অর্জুন, তুমি ও আমি বহুবার এসেছি। তুমি জান না, আমি সে সব জানি। আমি জন্মরহিত, অবিনশ্বর, সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও নিজের মায়ার দ্বারা জন্ম নিই। কখন? "যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।" ধর্মে যখন গ্লানি দেখা দেয় তখন আমি আবার আসি। অর্জুন আর Protest করলেন না। শুনে যাচ্ছেন। বলছেন শ্রীকৃষ্ণ "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়। ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব।" সূত্র সকল আমাতে গ্রথিত, আমার মধ্যে সমস্ত জগত। আমি ছাড়া আর কেউ নেই। একমেবাদ্বিতীয়ম্। আমিই সূর্য হয়ে তাপ দিচ্ছি···আমা থেকেই জীবেরা এসেছে।

এইভাবে একে একে সাংখ্য, কর্ম, জ্ঞান, সন্ন্যাস, রাজযোগ ইত্যাদি সব বলা হ'ল। এবার দশম অধ্যায়ে অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে বলছেন, এখন তোমার বিভূতি জানতে চাই। শ্রীকৃষ্ণ তখন সংক্ষেপে তাঁর বিশেষ বিশেষ বিভূতির কথা বলে শেষে বললেন - আমার বিভূতির অন্ত নেই, "নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ", কত বলবো তোমাকে। তবে এইটুকু জেনে রাখো যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা/তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্।

যা কিছু ঐশ্বর্যযুক্ত, শ্রীসম্পন্ন, শক্তিসম্পন্ন, তা আমারই শক্তি, আমারই অংশ, শুধু তাই নয়, "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগত"—আমার মাত্র একাংশ দিয়ে আমি সমস্ত জগতটা ধরে আছি। অর্জুন বললেন, তুমি নিজের বিষয়ে যা বললে সব শুনলাম—এখন তুমি যদি আমাকে যোগ্য মনে কর তাহলে তোমার সেই বিশ্বরূপ আমায় দেখাও। কৃষ্ণ তখন অর্জুনকে তাঁর বিশ্বরূপ দেখালেন।

এরপর ভগবান আসল কথা যা বললেন অর্জুনকে তা হ'লো, তুমি আমাতে মন দাও। আমি ছাড়া গতি নেই। আমি ছাড়া কিছু নেই। আমাকে মন দাও আমাতেই থেকে যাবে। গীতার ভগবানের সার কথা হ'ল—আমি ছাড়া গতি নেই। গোটা গীতায় এই কথা—আমিই এই জগতকে পরিচালনা করছি। অর্জুন, তুমি যাদের জন্য শোক ক'রছো, তাদের সব মেরে রেখেছি। তোমাকে নিমিত্ত করে নিয়ে যাচ্ছি। আমায় এ যুদ্ধ কেউ আটকাতে পারবে না। কাজেই তুমি যুদ্ধ ক'রবো না বললেই হবে? তুমি কে হে? তোমার কান ধরে করাবো। তোমার ক্ষণিক বৈরাগ্য এসেছে বলেই এত কথা বললাম। অর্জুন তখন শুভাশুভ কর্মফল এড়াবার উপায় জিজ্ঞাসা করলেন। কৃষ্ণ বললেন, সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। সব ত্যাগ করে আমার শরণাপন্ন হও। এটাই গীতার দ্বিতীয় মূল কথা। অর্জুন গোড়ায় বড়াই করে বলেছেন, কেন যুদ্ধ ক'রবো? যখন বুঝলেন এসব ফাঁকা কথা, মনে জোর পাচ্ছেন না, তখন বললেন, "কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ। যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।" গুরুজনদের কেমন করে বধ করি—চিন্তায় আমার চিত্ত মোহগ্রস্ত হয়েছে। কাজেই প্রকৃত ধর্ম কি আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমায় উপদেশ দাও, বুঝিয়ে দাও। ভগবান তখনই গীতা বললেন, উপদেশ দিলেন। সব শেষে বললেন, আমার শরণ নাও, তাহলেই তোমার সমস্ত পাপ ভস্মসাৎ হবে। এখানেই অর্জুনের গোড়ার কথা অর্থাৎ "শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্" এর সঙ্গে link হ'ল। গীতা শেষ হ'ল।

গীতার যেখানে শেষ ভাগবতের সেখানে সুরু। আমি জগতের কর্তা—আমিই সব। কাজেই আমার শরণাপন্ন হও—এটাই গীতার শেষ কথা। ভাগবত ভক্তের কথা। ভাগবত রচনা করেছেন বেদব্যাস। মহাভারতও তিনিই রচনা করেছেন। কুরুক্ষেত্রের ইতিহাস যেমন দেখেছেন রচনা করেছেন। গীতা পুরাণ ইত্যাদি রচনা করেছেন। বেদব্যাস মস্ত কর্মী ও জ্ঞানী। অতবড় intellectual giant ভারতে আর আসেন নি। সেই বেদব্যাসকে প্রণাম করি। যাইহোক মহাভারত ইত্যাদি রচনা করে চিরজীবী ব্যাসদেব সরস্বতী নদী তীরে retired life lead করছেন। মন খারাপ। শান্তি পাচ্ছেন না। এমন সময় একদিন ভক্তশ্রেষ্ঠ নারদ এসে জিজ্ঞাসা করলেন তাঁকে—কেমন আছ? ব্যাসদেব বললেন, মন ভাল নেই। নারদ—কেন? ব্যাস—কি জানি! নারদ—তুমি এত কাজ করেছো, তোমার তো এমন হওয়া উচিত নয়। এর কারণ কি জান। দেখ, মহাভারতে তুমি সব বলেছো, ইতিহাস রচনা করেছো, কিন্তু ভগবানের লীলার কথা, কৃষ্ণের মহিমার কথা তো বলো নি—ন তথা বাসুদেবস্য মহিমা হ্যনুবর্ণিতঃ। ফাঁকে ফাঁকে একটু আধটু বলেছ অবশ্য। প্রতিটি অক্ষর কৃষ্ণ দিয়ে গ্রথিত হবে এমনভাবে একটি গ্রন্থ রচিত হওয়া দরকার। injection দিয়ে গেলেন নারদ। তখন ব্যাসদেব রচনা করলেন অত বড় ভাগবত গ্রন্থ। ছেলে শুকদেবকে পড়িয়ে দিলেন। সেই ভাগবত প্রচার হ'ল কোথায়?

রাজা পরীক্ষিৎ একদিন মৃগয়া করতে বনে গিয়ে ঘুরে ঘুরে খিদে তেষ্টায় খুব কাতর হয়ে শমীক মুনির আশ্রমে এসে জল আর খাবার চাইলেন। কিন্তু দেবে কে? মুনি তো তখন চোখ বুঁজে ধ্যানে ডুবে রয়েছেন। রাজার প্রার্থনা তিনি শুনতে পেলেন না। রাজা খুব চটে গেলেন। রাগের চোটে একটা মরা সাপ কুড়িয়ে নিয়ে মুনির গলায় ঝুলিয়ে রেখে চলে গেলেন। মুনিপুত্র শৃঙ্গী আশ্রমে এসে পিতার দুরবস্থা দেখে শাপ দিলেন—এই অধম

কাজ যে করেছে সাত দিনের মধ্যে তক্ষক দংশনে তার মৃত্যু হবে। রাজার কাছে এ খবর পৌঁছল। রাজা বুঝলেন অন্যায় হয়েছে। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা তাই অনশন ব্রত নিয়ে গঙ্গাতীরে মৃত্যু প্রতীক্ষায় বসে আছেন।

গীতায় ওদিকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ হচ্ছে। এখানে ভাগবতে রাজা মৃত্যু প্রতীক্ষার দিন গুনছেন। রাজার শাপগ্রস্ত হওয়ার খবর পেয়ে গঙ্গাতীরে রাজার কাছে দেশের বড় বড় পণ্ডিত সাধুরা সব সমবেত হয়েছেন। রাজা তাঁদের জিজ্ঞাসা করছেন কি করবো, উপায় বলুন। কেউ বললেন, ধ্যান করুন, কেউ বললেন যজ্ঞ করুন, কেউ বললেন জপ করুন, কীর্তন করুন···ইত্যাদি এক একজন এক একরকম উপদেশ দিচ্ছেন। এমন সময় ব্যাসপুত্র শুকদেব সেখানে এসে উপস্থিত। মাত্র ষোলো বছর বয়স তাঁর তখন। সকলে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে সম্মান দেখিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। রাজা বিনীতভাবে শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করলেন—আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে পারি কি? শুকদেব—কি প্রশ্ন? রাজা—মৃত্যু পথের পথিকের কি কর্তব্য, পাথেয় কি? শুকদেব—মহারাজ, চুপ করে বসুন, কান দিয়ে শুনুন, আমি ভগবৎ কথা কীর্তন করে যাব, সেই কথামৃত পান করুন। এই সাধুসম্মেলনে যে কথা ব'লবো সেই ভাগবত কথা শুনুন। জপ নয়, তপ নয়, শুধু শুনলেই হবে। "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহম্ ধুনোতি শমলং কৃষ্ণ সলিলস্য যথা শরৎ।" কর্ণে যদি ভগবৎ কথা প্রবেশ করে তো তাতেই মনের ময়লা কেটে যায় যেমন শরৎ কালে জলের বালিস কেটে যায়। এই হল ভাগবতের সূচনা।

ওখানে গীতায় ভগবান বলেছেন—আমি ছাড়া উপায় নেই। ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণ লীলা। সে লীলা ১০ম স্কন্ধে। প্রথমে সৃষ্টিতত্ত্ব, চন্দ্র-সূর্য-বংশ বিস্তার, ঐসব বংশের রাজাদের জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি নানা কথা চলেছে। পরীক্ষিৎ খুব ব্যস্ত হয়েছেন, কি ব্যাপার? জিজ্ঞাসা করলেন শুকদেবকে—কৈ কৃষ্ণ কথা তো বললেন না? শ্রোতা প্রশ্ন করলে আনন্দ হয়। শুকদেব তখন বলছেন—ভগবানের কথা যে প্রশ্ন করে সে ধন্য, যে বলে সে ধন্য।

ভাগবতে যিনি কৃষ্ণ তিনিই গীতার গুরুর বলগা ধরেছেন। ভাগবতে তিনিই বৃন্দাবনে এসেছেন, লীলা করছেন। শ্রীকৃষ্ণ লীলা বুঝতে হবে তিন ভাবে। কুরুক্ষেত্র লীলা, বৃন্দাবন লীলা আর দ্বারকালীলা নিয়ে। কুরুক্ষেত্রে কৃষ্ণ হলেন God the Philosopher. সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ। উপনিষদ রূপ গাভী থেকে দুধ দুইলেন গয়লার ছেলে কৃষ্ণ। সেই দুধই গীতা। পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ—সে দুধ খেল কে? অর্জুন নয়। ও খালি পাশে দাঁড়িয়ে থাকা গো বৎস মাত্র। খেতে খেতে কেবল চুঁ মারছে। সে দুধ পান করলো সুধী জনরা। যিনি ওখানে গীতায় বড় বড় কথা বলছেন "আমিই সব, আমিই তোমাদের নিয়ে যাচ্ছি, সব কিছু পরিচালনা করছি", তিনিই এখানে ভাগবতে বলছেন অহং ভক্তপরাধীনঃ—আমি ভক্তের পরাধীন। কি অদ্ভুত কথা। তোমার ইচ্ছায় প্রলয় হয়ে যায়, আর তুমি বলছো কিনা, তুমি অধীন। কেন, জান না সে ঘটনা? বিষ্ণু ভক্ত রাজা অম্বরীষ একবার সারা বছর দ্বাদশীর ব্রত পালন করে কার্তিক মাসে তিন দিন উপবাসের পর দ্বাদশীর পারণ করতে যাবেন এমন সময় দুর্বাসা মুনি এসে রাজার আতিথ্য গ্রহণ করে নদীতে স্নান করতে গেলেন। দুর্বাসার ফিরতে দেরী হচ্ছে। এদিকে পারণের সময় বয়ে যায় যায়। রাজা তাই নিমন্ত্রিত সকলকে দান ভোজন ইত্যাদি সেবা দিয়ে পরিতৃপ্ত করে নিজে এক গণ্ডুষ মাত্র জল খেয়ে নিয়ম রক্ষা করলেন। দুর্বাসা ফিরে এসে রাজার পারণ করার কথা শুনে রেগে গিয়ে জটা থেকে এক কৃত্যা সৃষ্টি করে ছেড়ে দিলেন রাজাকে বধ করার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে বিষ্ণুর সুদর্শন চক্র এসে কৃত্যাকে পুড়িয়ে ফেলে বিষ্ণু ভক্ত রাজাকে রক্ষা করল। চক্র এবার দুর্বাসাকে বধ করতে এগিয়ে গেল। দুর্বাসা প্রাণ ভয়ে ছুটে পালালেন। কোথাও নিস্তার না পেয়ে ব্রহ্মার কাছে গেলেন, ব্রহ্মা তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না। কৈলাসে শিবের কাছে গেলেন। শিবও তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না। বললেন, বাবাঃ এ স্বয়ং নারায়ণের সুদর্শন চক্র, এর হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার ক্ষমতা আমাদের কারও নেই। এ একই তিনিই পারেন। কাজেই বৈকুণ্ঠে গিয়ে নারায়ণকে ধরো। দুর্বাসা তখন নারায়ণের কাছে গিয়ে তাঁর চরণ ধরে বলছেন, প্রভু, আমায় রক্ষা কর। নারায়ণ বললেন, তোমায় আমি কি

করে রক্ষা করবো? তুমি যে আমার ভক্তের কাছে অপরাধ করেছো। আমি যে ভক্তের অধীন। তুমি অম্বরীষের কাছেই যাও। সে যদি ক্ষমা করে তবেই রক্ষা পাবে। দুর্বাসা রাজার কাছে এসে ক্ষমা চেয়ে প্রাণ ভিক্ষা চাইলেন। রাজা তখন সুদর্শন চক্রের স্তব করে চক্রকে শান্ত করলেন। দুর্বাসা রক্ষা পেলেন

অনেক ভক্ত আছে যারা রাজ্য চায়, সুখ চায়, ঐশ্বর্য চায়, মুক্তি চায়। আর এক ধরণের ভক্ত আছে যারা শুধু আমার নাম করছে, আমার ভাবছে, আমাকেই চাইছে। তাদের কৃপা করে যদি বলি 'মুক্তি নাও', বলে 'না'। তবে কি চাও? বলে, "তোমার সেবা ক'রবো। মনুষ্য জন্ম দিও, ভক্তি দিও। জন্মে জন্মে জীবনে মরণে প্রাণনাথ হও তুমি। মিলনেতে নাথ সকলি পুরাবো আমি বারে বারে আসিব যাইব, নাচিব হাসিব কাঁদিব, প্রেমের তুফানে ভাসিব ভাসাব। এই যে ভক্ত, এদের কাছে বাঁধা না থেকে পারি? "যে দারাগার পুত্রাপ্ত-প্রাণান্ বিসৃজ্যমিহ পরম্ দ্বিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্ত মুৎসহে।" যারা স্ত্রী গৃহ, পুত্র স্বজন, প্রাণধন, ইহলোক পরলোক সব ছেড়ে একমাত্র আমাতে আশ্রয় করেছে তাদের কি ছাড়তে পারি?

গীতায় কুরুক্ষেত্রে রথের বল্গা ধরে সব পরিচালনা করছেন—এ এক মূর্তি। এখানে ভাগবতে কৃষ্ণ যশোদা দুলাল—এই তাঁর পরিচয়। কৃষ্ণ নামে যত অর্থ তাহা নাহি জানি। কৃষ্ণ কথার মানে জান? অনেকে বড় বড় কথা বলে, আমি ওসব জানি না। আমি জানি সে যশোদা নন্দন। যার কাছে ঠ্যাঙ্গা খাচ্ছেন। দুষ্টুমি করেছে, মা একদিন বেঁধেছেন, মারছেন। ওখানে বিশ্বরূপ দেখালেন, এখানে ঠ্যাঙ্গা খাচ্ছেন। ওখানে ঐশ্বর্য, বৃন্দাবনে কেবল মাধুর্য। গীতায় ঐশ্বর্যজ্ঞানে জগত স্তম্ভিত। সব ঐশ্বর্যের প্রশংসা।

ঐশ্বর্যজ্ঞানে মাধুর্য্য নষ্ট হয়। স্টেশনে receive করতে গেছ একজনকে। দেখলে 1st class থেকে নামলেন তিনি—এ যে বিড়লা। তখন প্রেম এতটুকু হয়ে গেল। মা আমাকে বাঁধছে, মারছে—সেটাই তাঁর ভাল লাগছে। বৃন্দাবনে সখারা কাঁধে উঠছে—আম পাড়বো, কেষ্ট, তোর পিঠে উঠবো। তারা কৃষ্ণকে ঠাকুর বলে গ্রাহ্য করে না।

ওখানে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখালেন, তা দেখে অর্জুনের মত বীরও ভয়ে কেঁপে উঠলেন, প্রার্থনা করলেন—তোমার সৌম্যরূপ দেখাও। এখানে ছেলেরা যশোদাকে এসে বললো 'মা, গোপাল এক ডেলা মাটি খেয়েছে।' গোপাল বললেন, না মা, আমি মাটি খাইনি, ওরা মিথ্যে কথা বলছে। মা বললেন, দেখি গোপাল, হাঁ কর্ তো। কৃষ্ণ হাঁ করতেই যশোদা বিশ্বরূপ দেখছেন। ভাবলেন, ও দুষ্টু ছেলে অনেক রকম করে ধমক দিয়ে বললেন, মুখ বন্ধ কর্। ভাবটা এই—ওটা ওখানে অর্জুনকে দেখিও, আমাকে ওসব দেখিও না—এটা বৃন্দাবন।

ভাগবতে আর এক জায়গায় রাসলীলাতে একটি শ্লোক আছে—তাতে কৃষ্ণ বলছেন, এই পুরনারী গোপিনীরা সমস্ত লজ্জা বিসর্জন দিয়ে আমার কাছে এসেছে। সংসার বন্ধন ছিন্ন করে সব ছেড়ে আমার কাছে এসেছে। এদের ঋণ কি করে শোধ ক'রবো? তাই বললেন, তোমাদের ঋণশোধ করতে পারবো না। বেশ, তাহলে insolvency নাও। তুমি ভগবান, পারবো না বললেই হবে? না, ব্রহ্মার আয়ু পেলেও পারবো না। কেন? বাধছে কোথায়? চৈতন্য চরিতামৃতে সুন্দর বলা আছে কৃষ্ণ কেন ঋণশোধ করতে পারলেন না। কারণ, কৃষ্ণের মধ্যে বিরোধ ভাব এসে গেছে। কৃষ্ণের এক প্রতিজ্ঞা আছে যে "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্" অর্থাৎ যে আমাকে যেভাবে ভজনা করবে, আমি তাকে সেই ভাবেই তুষ্ট করবো, সে সেই ভাবেই আমাকে পাবে। কাজেই গোপীদেরও তাহলে সেই ভাবেই return দিতে হয়—তারা সমাজ বন্ধন, লজ্জা, ভয়, সংসার সব ছেড়েছে, কিন্তু তোমাকে ছাড়তে পারে না। কিন্তু কৃষ্ণ তো আর গোপীদের জন্য গোটা সংসার ছাড়তে পারেন না, তাহ'লে সংসার দাঁড়ায় কোথায়। এখানেই কৃষ্ণের বিরোধ লেগে গেছে। তাই বললেন পারবো না। এইজন্যে ভগবান এখানে গোপীদের কাছে ঋণী হয়ে রইলেন।

কৃষ্ণ তত্ত্ব বুঝতে হলে তিনটি ভাবের লীলা বুঝতে হবে। কুরুক্ষেত্রের God the Philosopher, দ্বারকার

God the Ruler আর বৃন্দাবনের God the Lover রূপে কৃষ্ণকে বুঝতে হবে। তবে খেলা দুটী—ঐশ্বর্য লীলা আর মাধুর্য লীলা। গীতার কুরুক্ষেত্রের কৃষ্ণলীলা ঐশ্বর্যলীলা। দ্বারকায়ও তাই। মাধুর্যলীলা কেবল বৃন্দাবনে।

ভক্ত শ্রোতারা মন্ত্র মুগ্ধের মত শুনলেন পুলিনদাদার কণ্ঠে ঝরোয়া ঢঙে গীতা ও ভাগবতের তুলনামূলক সরস আলোচনা। রাত প্রায় সাড়ে আটটা বাজে। অশীতিপর বৃদ্ধ তাই বাড়ী ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়েছেন। দাদা ভাই দুজনে অর্থাৎ পুলিনদাদা আর আমাদের স্বামীজী এতক্ষণ বসেছিলেন একাসনে। ঘরে ফেরার তাগিদে গাত্রোত্থান করে অগ্রজ হঠাৎ সন্ন্যাসী হিসেবে স্বামীজীকে প্রণাম করতেই স্বামীজী চমকে বলে ওঠেন, দাদা একি একি। বলেই তিনিও আবার পুলিনদাদাকে পাল্টা প্রণাম করলেন। রসিকপ্রবর পুলিনদাদা তখন রহস্য করে বললেন—একটি ঐশ্বর্য আর একটী মাধুর্য। সমবেত ভক্ত শ্রোতার মধ্যে পড়ে গেল হাসির রোল। মাধুর্যরসে ভরে দিয়ে গেলেন সেদিনের দেবায়তন-সন্ধ্যা ভাগবতরত্ন পুলিনদাদা।

———

# গোপালকে মিনতি

**শ্রীনাচুগোপাল হাজরা**

গোপাল, তোমার কাছে এসেই কেন লজ্জা পেলাম
কেন বা পালিয়ে গেলাম অনেক দূরে
কেনই বা আঁখি মুদে দুহাত জুড়ে
ক্লান্ত হ'য়ে প্রণাম জানাই মাথা নুয়ে
যখন তোমার কর্ণা হাসি
বাজিল মোর হৃদয় ছুঁয়ে।
তখন কেন লজ্জা পেলাম
পালিয়ে গেলাম অনেক দূরে।

গোপাল, তখন আমি তুচ্ছ হ'য়ে
শিশুর মত ক্ষুদ্র হয়ে
মনে মনে যত্ন ছিলাম ধরতে তোমায় দুহাত দিয়ে।
অবজ্ঞা তাই ছিল মুখে
সংগোপনে পাওয়ার সুখে।
তখন তোমার কর্ণা হাসি
বাজিল মোর হৃদয় ছুঁয়ে।
বাইরে কি তাই লজ্জা পেলাম,
পালিয়ে গেলাম অনেক দূরে।

গোপাল, তোমার ছোট হাতে
জাল ফেলো যে অনেক দূরে
সে জালের ঘূর্ণিপাকে
কত যে জড়িয়ে পড়ে
আপনি এসে অচিন দেশে
পায়ে তোমার লুটিয়ে পড়ে
তখন তাদের মাথায় তুমি বসো চড়ে
অন্তরেতে পুলক ভরে
তাই কি তখন লজ্জা পেলাম
পালিয়ে গেলাম অনেক দূরে।

গোপাল, তোমার অশান্ত ভাব।
প্রশান্ত কেউ থাকতে পারে?
মুশান্তদের প্রাণান্ত হয়
কর্ণা হাসির পরশ পেলে।
মা যশোদার স্নেহ নিয়ে
নন্দ পিতার বক্ষ নিয়ে
ছুটে আসে তখন তারা পাগল পারা
অঝোরে বয় নয়ন ধারা বাঁধন হারা।
তখন তারা নিমেষে হয় আপন হারা
তাই কি গোপাল লজ্জা পেলাম
তখন আমি পালিয়ে এলাম অনেক দূরে
গোপাল কেন ডাক দিয়েছ অমন করে।

# শ্রীশ্রীসত্যানন্দদেব কী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাপ্তি !

ডাঃ মহীয়া বসু, এম. ডি., এফ. আর. এইচ. এস., এম. আর. এইচ. এ.

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

সিউড়ীর শ্রীপ্রভাকর ঘোষ ( স্বামী বিবিদিষানন্দ ), নামী উকিল, সাধু ভক্ত-প্রাণ। চিত্তে বাসনা জাগল ; বন্ধুবর হালদার ( স্বামী উমানন্দ ) এর মেজদা আজন্ম ত্যাগী ব্রহ্মচারী সত্যব্রতর একবার দর্শন কামনা। প্রভাকরের প্রেমার্তির বুঝি বা হোল ভক্তযোগ। এলো বন্ধন-মুক্তির মহালগ্ন।

বিদ্যুরভি জ্যোতির্ঘন অরূপরতনে হেরি প্রভাকর চমকিত প্রাণ : কে ইনি ! এ যে সাক্ষাৎ প্রভু রামকৃষ্ণ ! এক ধ্যান এক মন। প্রভাকর ধেয়ে চলেন আপন আলয়ে। সহধর্মিণীরে স-উল্লাসে বলেন : দেখে এলাম আজ সাক্ষাৎ রামকৃষ্ণকে···। আর কথা নাই মুখে। ভাষা-হারা প্রাণ। মন-মুখ বুঝি এক হয়। প্রভাকরের বাসনা-কামনার জোয়ার-জলে হয় মুক্তিস্নান।

শ্রীমতী পুষ্প—বাতিকার জমিদার শ্রীকুলেন্দ্রনাথ সিংহের সহধর্মিণী ; দীক্ষা লাগি' সত্যব্রতর শ্রীচরণাবনতা। দীক্ষান্তে একদিন বললেন শ্রীঠাকুর : মা, আমাকে তোমার কি মনে হয়।

শ্রীমতী পুষ্পর কোমল কণ্ঠ : স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণদেব।

জমিদার-গৃহিণী পুষ্প জগোময় জল-ঘর হঠাৎ একদিন দেখেন : সত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গ কেমন যেন হয়ে গেল ৺মা ভবতারিণীর মত। আনন্দ-বিহ্বল পুষ্প কৃপা ধন্যা !

তরুণ তাপস শচী। আশৈশব সাধু সেবা, তাঁদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা ও সেবা করা কেমন যেন তার সাধু সাধু ভাব। বাতিকার দেব-ভবনে বহুভক্ত জনের সমাবেশ। দলের দলীয় হ'য়ে শচীও একদিন নির্ভয়ে শ্রীভবনে এসে যায়। শ্রীঠাকুরের শ্রীচরণ-পরশন অন্তে আনত মুখ তুলতেই নয়নে-নয়নে প্রেম-দরশন, বিহ্বল বিমোহন মন : ইনি যে সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ।

শ্রীঠাকুরের পরশনে-দরশনে মহালাভ—মন মুখ তার একাকার। এই শচীই পায় শ্রীঠাকুর সত্যানন্দের সেবা—ভোগ-ভার। তিনি নাম দেন তার—'আনন্দ'। আর, এই আনন্দই হয় একদিন দরশন-ধন্য।

—"আনন্দ, ৺মাকে দেখবি ?" বললেন শ্রীঠাকুর, "বেশ, ৺মায়ের ধ্যান করে যা—।"

আনন্দর ধ্যান যত না দেখা তত বেশী। চেয়ে চেয়ে চাক্ষুষ দেখল সে : আজানুলম্বিত বাহু শ্রীঠাকুরের আপাদমস্তক কৃপাবরিত হচ্ছে শোভন লোভন ৺শ্রীশ্রীমা অন্নপূর্ণা রূপ-রাগে ! শচীর আর সাধু পরশরতন খুঁজে ফিরতে হয় না। চরম দরশন আর পরম পরশনে শচীর হয়ে যায় ইতি, হয় তার নব জন্মান্তর—আনন্দ চৈতন্য।

পরশরতন লাগি বাঁকু খুঁজে ফেরে নিত্য নিরত শচীর মতন।

কৃপাসিন্ধুর কৃপা আঁখি আঁখির আড়াল হয় না বাঁকুর। শ্রীঠাকুরের পরম কৃপা-ধন্য বাঁকু হয় 'সেবানন্দ'—শ্রীঠাকুরের সেবার ভার তার।

নরসিংহপুরের জঙ্গল-আশ্রমে যাবেন প্রভু। আনন্দ ও সেবানন্দ উভয়েই প্রস্তুত। শ্রীঠাকুর সাথে নিলেন সেবানন্দকে। কাছে কাছে একা পেয়ে আনন্দে বাঁকু গরগর। পাগলের মতন প্রশ্ন করল সে : ঠাকুর, এই শরীরটা আপনার কে—? সদা হাস্যময় শ্রীঠাকুর মৃদু হাস্যে নৃত্যের তালে তালে করেন আনন্দ-নৃত্য। স্নান-অন্তে সেই আশ্রমের ছাউনি-ঘরে হ'ন তিনি ধ্যান-মগন। অদূরেই বাঁকু সেই মত ধ্যান-রত। কিশোর মন হঠাৎ চোখ খোলে। চোখ মেলে নয়ন ভরি' দেখে—, তার ঠাকুর কোথায়। সেই আসনে বসে আছেন—ব্রজবনবিহারী নয়নাভিরাম শ্রীকৃষ্ণ। বাঁকু স্তব্ধ স্থির।

প্রশ্ন তার শেষ ! শেষ উত্তর মিলে গেল জীবনে তার !

এই শচী আর বাঁকু। শ্রীঠাকুরের দু'টি নাম—আনন্দ

আর সেবানন্দ। একজনের ভাব—টান, আর একজনের মনোভাব—টান-টান, Equilibrium! একের হাতে কল্প, অপরের হাতে রয়।

শ্রীসত্যানন্দ বলে গেলেন—"সেবানন্দ, তোমার শিব অংশ, আর আনন্দময় বিষ্ণু···।"

সেদিনের মতন বাতিকার লীলাবসান। বৈশাখী বকুল বেলা। কাশীপুরে কেয়ার পালা। ট্রেনে 'পুনরাগমনায়চ' বলতে এসেছেন ভক্তজনগণ, সঙ্গে প্রভাকর (স্বামী বিবিদিষানন্দ), সঙ্গী তাঁর বৃদ্ধা মাতা।

—"প্রভাকর তোমার মা'কে ধর···" হঠাৎই পিছনে ফণদৃষ্টিপাতে ওই বলে ট্রেনে উঠলেন প্রভু।

পঙ্কনোন্মুখ বৃদ্ধা মাতাকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন প্রভাকর। অন্তর্যামী অধিনায়ক তখন নয়ন সম্মুখে নাই। যন্ত্র-চালক তৎক্ষণে মনের মানুষ প্রাণের ঠাকুরে ছিনিয়ে নিয়ে ছুটে চলেছে।

তাতে কী!—"নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই।" যেমনি সত্য—"গগন না ছুলে তোমায় ধরিবে কে বা।" তেমনি চিরসত্য—নয়ন না হ'লে তোমায় চিনিবে কেবা।

প্রভাকরের বৃদ্ধা মাতার চক্ষে বৈশাখী-বন্যা-ধারা। আর প্রভাকর—। শুধু বিনম্র নত আঁখি। তখনও তাঁর আকুল আঁখি গুমরি উঠেছিল: "দাঁড়াও আমার আঁখির আগে, দাঁড়াও হে! তোমার দৃষ্টি ছুঁয়ে লাগে!!"

ভগবান, আপন সখার মতন ভাবগ্রাহী; ভক্তের বোঝা বহেন তিনি আপন হস্তে শ্রীঅঙ্গে! তাই তো, চলে-যাওয়া শ্রীভগবানে পুত্র প্রভাকর দেখলেন—সাক্ষাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ। আর, পঙ্কনোন্মুখ বৃদ্ধা মাতা চাক্ষুষ করলেন—সাক্ষাৎ শ্রীগৌরাঙ্গ!

সেদিনের সোনা-ঝরা গোধূলি বিন্দু বিন্দু করি মিলায় মলয় পবনে। বিন্ধ্য সন্ধ্যা ঘনায় একটু একটু করি। সিউড়ীর সেবাশ্রম। সমাগত অগণিত ভক্ত। বিশেষকে দর্শন করতে আসছেন অতি বৃদ্ধা ভক্তিমতী এক বিশেষণা। নয়নে নয়নে নয়নাপাত। সমাগতা আদরিণীয়ার জীবন-জাহ্নবী-নবকল্লোলে কেনিলোচ্ছলাঃ—"আকুল হ'য়ে দুকূল বুঝি ভাসল রে!"

নীরব নম্র আঁখি দুটি পল্লবহীন—ক্ষণ-ঝরঝর ক্ষণকালে। বিনম্র শির আনত হয় ও-দুটি রাতুল শ্রীচরণে আকুল আকর্ষণে।

শ্রীশ্রীসত্যানন্দ বললেন: "যে মাথা শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণে শ্রীসারদা মায়ের শ্রীচরণে, স্বামীজীদের চরণে লুটিয়েছেন, সে-মাথা কোথাও কি আর নত করতে আছে!"

যিনি দেখলেন আর শুনলেন, তিনিই বললেন কোমল কণ্ঠে: "এখানে যে দেখি সব একাকার। এ যে আমি স্পষ্ট দেখছি।" ইনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের ভক্ত দামাকালীর অতি বৃদ্ধা পিসিমা তথা শ্রীশ্রীসারদামায়ের দীক্ষিতা কন্যা।

তবু ওরিল না চিত্ত—সর্বতীর্থ সার! এখনো দ্বিধা, এখনও দ্বন্দ্ব।—"কেন রে এই দুয়ারটুকু পার হ'তে সংশয়।" ওরে মন, ওরে অবুঝ মন। একবার, শুধু একবার—"ডুব দেরে মন কালী বলে।" নয়ত,—"জয় মা বলে ভাসা তরী", নয় বা -"জয় অজানার জয়।" বলি ডুব দেও দেখি ওই ভব-মদে—"অরূপ রতন আশা করি!" দেখ দেখি চাহি, পাও কি-না সেই সাধনধনে। সে যে দুবাহু বাড়ায়ে—"জীবন-মরণের সীমানা ছাড়ায়ে বন্ধু হে আমার; রয়েছ দাঁড়ায়ে।

"হায় গো। ব্যথায় কথা যায় ডুবে যায় যায় গো!—বেলা যে যায়!!!

ওরে পাগল, তোর আগল খোল। বাহির পানে চোখ মেলে দেখ দেখি—"সে যে কাছে এসে বসেছিল, তবু জাগনি!" ওরে অন্ধ অন্ধ মন আমার।—"কী ঘুম তোর পেয়েছিল, তবু জাগনি।" তবু তার কত দয়া, কত মায়া, কত কৃপা, কত করুণা!—"ওগো দুখ আগানিয়া। বুকে চমক দিয়ে তাই ত ডাক।" তাইতো তোমায় "সকাল বেলায় চেয়ে দেখি, দাঁড়িয়ে আছ তুমি এ কী।"

তবু, তবুও নাশে না মোহ! মরে না অহম্!! ঘোচে না মায়া-কাজল!!! ওরে মন, মনরে আমার! এখনও পরীক্ষা-নিরীক্ষা, কালি-কলমে আচার-বিচার বিশ্লেষণ। মণি ছাড়ি দেখ চাহি—

"আনন্দলোকে মঙ্গলালোকে বিরাজ,
সত্য সুন্দর।"

মনের 'মরলা' ঘুচায়ে 'ময়' হ'য়ে যারে—তুমিময় তন্ময় নামোময়, প্রীতিময়, ভাবময়। বেশ, তবে তাই হোক—

"অশ্রু-আঁখি 'পরে যদি ফুটে ওঠে তব স্নেহ-চোখ।
তবে তাই হোক।
দুঃখের তিমিরে যদি জ্বলে তব মঙ্গল-আলোক।
তবে তাই হোক।" (ক্রমশঃ)

# সাধুসঙ্গ

**স্বামী ভূতানন্দ**

আশ্রমে যাঁরা আসা যাওয়া করেন তাঁদের প্রায় প্রত্যেকের কাছে একটা কথা শোনা যায়—'মশায় আশ্রমে যতক্ষণ থাকি একটা অদ্ভুত শান্তি-আনন্দ-পবিত্রতায় মনটা ভরে থাকে। সংসারের সব মলিনতা মুছে যায়, একটা অন্য রাজ্যে চলে যায় মন। কিন্তু যতক্ষণ আশ্রমে থাকি ততক্ষণই। তারপর যেই আশ্রমের গেট পেরিয়ে বাড়ির দিকে চলতে সুরু করি, অমনি ধীরে ধীরে আবার যে কে সেই।' এটা কিন্তু খুব সত্যি কথা। ওই উচ্চ দিব্য অনুভূতির রাজ্য থেকে মন যে কখন নেমে গেল টেরই পাওয়া যায় না। কেন এমন হয়? এটা আর কিছু নয়, সাধু সঙ্গের প্রভাব। এ প্রভাব কাজ করে সূক্ষ্ম স্পন্দনের মাধ্যমে। সাধুর আশ্রম স্বভাবতঃই একটা সৎ vibration এ ভরপুর থাকবে। যে সেখানে যাবে তার মনের স্পন্দন ঐ স্পন্দনের দোঁয়ায় খানিকটা প্রভাবান্বিত হবেই। এই কম্পন বা স্পন্দন কিন্তু এক এক আধারকে এক এক ভাবে প্রভাবিত করে। এটা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্পন্দনের সমধর্মীতা বা সমধর্মীতা যতখানি হবে, মনের ওপর প্রভাবও ততখানি পড়বে। আমরা দেখি একই বাড়ীতে দুজন গেছে কিন্তু একজনের এত ভাল লেগেছে যে, সে আনন্দে বিভোর হয়ে আর ফিরে আসতে চায় না; কিন্তু আর একজন ছটফট করছে কতক্ষণে উঠে চলে যাবে। এমনকি ভগবান রামকৃষ্ণের সঙ্গ ছেড়ে নৌকায় গিয়ে বসতে চায়।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, "একটু একটু করে সৎসঙ্গ করতে হয়। বাড়িতে কেবল বিষয়ের কথা। রোগ লেগেই আছে। পাখী দাঁড়ে বসে তবে রাধেরাম বলে। বনে উড়ে আবার কাঁ কাঁ করে।"

বেদান্তী মুখে ঠাকুর সত্যানন্দ বলেছেন—"যেখানে চিৎবিদ্যুতিনের যে রকম খেলা হয় সেখানে গেলে মনের অবস্থা সেই রকম হয়। যেমন যেখানে অবতার পুরুষ বা সাধু পুরুষরা থাকেন সেখানকার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে প্রকাশিত। সেখানে গেলেই মন আপনি অন্যরকম হয়ে যায়। আবার যদি বাহ্যজগৎ টকিতে যাও, তখন আবার মন অন্যরকম হয়ে যায়। সেখানে যারা ওই সব করে তাদের শরীরের চিৎবিদ্যুতিনে তখনকার আবহাওয়া charged হয়ে থাকে। চিৎবিদ্যুতিন হচ্ছে চেতন রাজ্যের ক্ষুদ্রতম অংশ। চিৎবিদ্যুতিনের একটা আকর্ষণ আছে—সৎ চিৎবিদ্যুতিন সৎকে আকর্ষণ করে। সাধু মহাপুরুষদের মূর্তি দেখলেই কেন মাথা নত হয়, ভাল লাগে জানো? প্রথমে হচ্ছে তোমার চিৎবিদ্যুতিন সৎভাবে প্রকাশিত, সেইজন্য কোনো সাধুর সংমূর্তি দেখলেই তোমার ওই রকম হয়। দ্বিতীয় হচ্ছে কোনও সাধুর যখন ছবি তোলা হয় সেই ছবির সঙ্গে সাধুর শরীর থেকে যে দিব্য তপস্যা প্রসূত চিৎবিদ্যুতিন বেরোয় সেটাও ওই সঙ্গে থেকে যায়।... সেই সাধুর অঙ্গের চিৎবিদ্যুতিন আর তোমার চিৎবিদ্যুতিনে একটা মিতালি হয় বলে এত ভাল লাগে।" ইংরাজীতেও একটা প্রচলিত কথা আছে "Like unto like." অর্থাৎ যার মনের গঠন বা সংস্কার যেমন, পরিবেশ থেকে সে ঠিক সেই রকম জিনিষ টেনে নেয়। যার মনে সৎ হবার ইচ্ছা আছে, ভাল হবার ইচ্ছা আছে সে ঠিক একটা সৎ পরিবেশ বা সৎসঙ্গ খুঁজে নেয় এবং সেটাই তার ভাল লাগে। তাই একটা প্রবাদ আছে—Man is known by the company he keeps.

ধর্ম জগতে প্রবেশের জন্য প্রথম প্রয়োজন শ্রদ্ধা। "আদৌ শ্রদ্ধা।" সাধুসঙ্গের প্রথম উপকারিতা এই শ্রদ্ধা উৎপাদন। সাধুর সঙ্গ বারে বারে করতে করতে মানুষের মনে শ্রদ্ধার উদয় হয়। শোলার আতা দেখলে আসল আতার উদ্দীপন হয়। তেমনি সাধু দেখলেই ঈশ্বরের উদ্দীপন হয়। সাধুসঙ্গে শ্রদ্ধা কেন হয়? এপ্রশ্নের উত্তরে

ঠাকুর সত্যানন্দ বলেছেন—"তাঁরা ( সাধুরা ) তো ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সম্পূর্ণ বিশ্বাসী, তাঁকে নিয়েই পড়ে আছেন। সাধুদের মন, প্রাণ, অন্তরাত্মা অহরহ তাঁকেই চিন্তায় রত। কাজেই তাঁদের কাছে গেলেই, তাঁদের সঙ্গ করলেই সাধারণ লোকের ঈশ্বরে শ্রদ্ধা জন্মে। সাধুরা হচ্ছেন বিশ্বাসের পূর্ণ প্রতীক। তাঁদের তিনি ছাড়া তো আর কিছুই নেই। যেমন একটি বিরাট আগুনের কাছে গেলেই আপনি আগুন জ্বলে যায়।" যেমন সঙ্গদোষে শতগুণ নাশে; তেমনি আবার সঙ্গগুণে শতদোষ নাশে।

সংসারী জীবের অবস্থা কি? মায়ার অক্টোপাশে বদ্ধ। শেষদিন পর্যন্ত হুঁশ হয় না। শঙ্করাচার্য বলেছেন—

"করতৃত কম্পিত শলিত দণ্ডম্
তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্।"

হাত কাঁপছে, হাত থেকে লাঠি খসে পড়ে যাচ্ছে, লাঠি ধরারও শক্তি নেই, তথাপি আশা ভাণ্ড পরিত্যাগ করা হচ্ছে না। তার মাথার কাছে মৃত্যু দাঁড়িয়ে, সে হয়ত তখনও বলছে "বাতির সলতেটা একটু কমিয়ে দে, বেশী তেল পুড়ছে।" তিনি উপায়ও বলেছেন, বলেছেন মহাজনদের কথা:

"ক্ষণমিহ সজ্জন সঙ্গতিরেকা
ভবতি ভবার্ণব তরণে নৌকা।"

এক ক্ষণের সজ্জন সঙ্গ ভবসাগর পারে নিয়ে যেতে পারে। শ্রীরামকৃষ্ণ দেবকে জিজ্ঞাসা করলেন একজন ভক্ত—"মহাশয় সংসারীদের উপায় কি?" শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন,—"সাধুসঙ্গ। ঈশ্বরীয় কথা শোনা। সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে, কামিনীকাঞ্চনে মত্ত। মাতালকে চালুনির জল একটু একটু খাওয়াতে খাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁশ হয়। আর সৎগুরুর কাছে উপদেশ ল'তে হয়।" ওষুধ যেমন অল্পমাত্রায় করে নিয়মিত সেবন করে গেলে উপকার হয়, তেমনি নিয়মিত সাধুসঙ্গ করে যাওয়ার উপকার ক্রমে বোঝা যায়। সাধুসঙ্গের এবং ঈশ্বরীয় কথা শোনার মাহাত্ম্য ও চরম উপকারিতার প্রমাণ হচ্ছে ভাগবত। ব্রহ্মশাপগ্রস্ত রাজা পরীক্ষিৎ মৃত্যুর জন্য দিন গুণছেন। আর মাত্র সাতদিন বাকি। মুক্তির উপায় বলতে বহু ঋষি মুনি জ্ঞানীগুণী এসেছেন। কিন্তু কেউ ঠিক জোর করে সদ্যমুক্তির উপায় বলতে পারছেন না। সে সময় ভগবান শুকদেব পরীক্ষিৎকে উপায় বললেন—"তোমাকে কিছুই করতে হবে না, তুমি শুধু শুনে যাও। আমি হরির অমৃতলীলা বর্ণনা করছি তুমি শুধু শোনো। শ্রীহরির কথা শ্রবণে সাতদিন পর মৃত্যুর সময় তুমি হরির চরণেই চরণাশ্রিত হবে, এতে সন্দেহ নাই।" সৃষ্টি হ'ল মধুর হতেও মধুর ভাগবত, জীবের মুক্তির শ্রেষ্ঠ উপায়।

এই ভাগবত মুখে শ্রীভগবান উদ্ধবকে বলেছেন: সাধুসঙ্গ অন্য সকল সঙ্গেরই নিবৃত্তি ঘটাইয়া দেয়; আমি সাধুসঙ্গদ্বারা যেরূপ বশীভূত হই; যোগানুষ্ঠান জ্ঞানার্জন, ধর্মনিষ্ঠা, বেদপাঠ, তপশ্চরণ, দান, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতাচরণ, দেবার্চন, গোপায়ন জপ, তীর্থসেবা, বা যম-নিয়মাদির দ্বারা সেরূপ বশীভূত হই না" ( ১১।১২।৯-২ )। সাধুসঙ্গে ভগবান অতেন্দ্র বশীভূত হন। কারণ বলছেন—সাধুসঙ্গ অন্য সব সঙ্গের নিবৃত্তি ঘটিয়ে দেয়। এ যে যোগের অবস্থা—চিত্তবৃত্তির নিরোধ! সমস্ত বৃত্তি মুছে গিয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগে ভক্ত ভগবানের একাকারত্ব। এই সঙ্গমুক্ত অবস্থা ভয়ানক কঠিন ব্যাপার এবং বহু সাধনান্তেও মনের এ অবস্থা আসে না। কিন্তু সাধুসঙ্গে বিনা চেষ্টায় মন ভগবৎ কথায় এত আকৃষ্ট ও অভিভূত থাকে যে, সেখানে অন্য সব বৃত্তি আপনিই মুছে যায়। তাই ঈশ্বর নিজে এসে কৃপা করে ধরা দেন।

সাধুসঙ্গের ফলে সদসৎ বিচার আসে এবং ধীরে ধীরে মনে প্রার্থনা জাগে। ঈশ্বরের কাছে প্রাণের আকুতির নিবেদন সুরু হয়। তারপরই আসে ব্যাকুলতা। আর ব্যাকুলতা এলে একটা দাবি একটা জোর আসে এবং না পেলে কান্না আসে। এই চোখের জলই মনের সব মলিনতা ধুইয়ে দেয়, অন্ধকারের অবসানে অরুণোদয় হয়। অধ্যাত্ম রামায়ণে আছে—শ্রীরামচন্দ্র শবরীকে বলেছেন: হে শবরী ভক্তিপথের সমস্ত সাধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে সাধুসঙ্গ।—"সতাং সঙ্গতিরেবাত্র সাধনং প্রথমং স্মৃতম্"—( অ১০।২২ )। আবার নারদীয় ভক্তি সূত্রেও আছে "মহৎ সঙ্গস্তু দুর্লভোঽগম্যোঽমোঘশ্চ"—মহৎ পুরুষের সঙ্গ দুর্লভ, অগম্য

এবং অবোধ অর্থাৎ কখনও ব্যর্থ হয় না ( সূত্র ৩৯ )। সঙ্গের প্রভাব অবার্থ। "Environment creates the man" পরিবেশ বা পারিপার্শ্বিকের প্রভাব চরিত্রগঠনের ওপর খুবই বেশী। জলবিন্দুর উদাহরণ নিয়ে একটি সুন্দর হিন্দী দোহা আছে এ বিষয়ে ( দোহাটি শুনেছিলাম জৈনাচার্য শ্রীপুণ্যবিজয়েন্দ্র সূরির কাছে ) :

"অহিমুখ পড়্যো সো বিষ ভয়ো
　　কদলী কন্দ কপূর
সীপ পড়্যো মোতী ভয়ো
　　সঙ্গতি না ফল সূর।" অর্থাৎ এক বিন্দু স্বাতীর জল সাপের মুখে পড়ে বিষ হয়ে গেল, কলাগাছের কাঁদীতে পড়ে কর্পূর হয়ে গেল, ঝিনুকে পড়ে মুক্তো হয়ে ফুটলো।

এই হচ্ছে সঙ্গের ফল। তাই খুব বুঝে সঙ্গ করতে হয়। শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলেছেন : "অসতের সঙ্গ ভাল নয়। তাদের কাছ থেকে তফাৎ থাকতে হয় : গা বাঁচিয়ে চলতে হয়।··· জল সবই জল ; নর্দমার জল ব্যবহার করা চলে না ; গঙ্গাজলে পূজা হয়।" সংসারের চারিদিকে মহামায়ার জাল বিছান। কামিনীকাঞ্চন রূপী অসৎসঙ্গের থাবা দিয়ে ফেলছে মানুষের উর্ধ্বমুখী দিব্য সত্তাটিকে। বাঁচার পথ কি নেই ? আছে। মহাসন্ত পলটুদাস বলেছেন :

"ভাগ রে ভাগ ফকিরকে বালকা
কামিনীকাঞ্চন বাঘ লাগা
দাস পলটু কহে বচেগো সো হী
　　যো সাধু কে সঙ্গ দিন রাত জাগা।"

পালাও পালাও, কামিনীকাঞ্চন বাঘ লেগেছে। শুধু সেই বাঁচবে যে সাধুর সঙ্গে দিন রাত জেগেছে। মহাপ্রভুও বলেছেন—"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়
　　লবমাত্র সাধুসঙ্গ সর্ব্বসিদ্ধি হয়।"　　( ক্রমশঃ )

# বিজয়ার আলপনা

**শ্রীঅর্চ্চনাপুরী**

বিজয়ার আলপনা
পূজা শেষ হয়ে গেছে
　　তুমি ত এখন প্রয়োজনহীন
　　এক মুঠো কল্পনা।
ছেঁড়া ছেঁড়া ফুল
কিছু বা ছিটানো
　　দুর্গাক্ষতের ছিটে
　　পড়ে আছে পূজাপীঠে।
পুষ্পার্ঘ্যের থালা হাতে যেন অবাহিতের মত
　　ঝরে পড়ে গেছে
　　নিবেদন শেষ ক'রে
　　বেদনায় সহত।
নিভে যাওয়া জাগরীদের কালিতে
　　কালো হয়ে গেছে মাটি
　　শুকায়ে গিয়েছে
　　আধো চন্দন বাটি।
আর কিছুখন বাদে
　　পরিচয়হীন রূপে
　　মুছে যাবে তুমি রূঢ় বাস্তবে
　　নিষ্ঠুর সংঘাতে।
প্রতিটি জীবন এমনিই যেন চিত্রিত আল্পনা
　　ক্ষণিকের কল্পনা
　　অলক্ষ্য হাতে আঁকাজোকা যেন
　　সময়ের বেদী বুকে
　　কোন্ দেবতার কে যে নিবেদন
　　কেহ তাহা জানে না তো
　　পূজা কার কোন্ রূপে।
বৈচিত্র্যের সম্ভার নিয়ে
　　আসা আর চলে যাওয়া
হায় রে নিয়তি এই তো জীবন
　　দুদিনের গান গাওয়া।

# গীতার বাণী

সাধনাপুরী

**নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।**
**ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥**

হে অর্জুন, তু (কিন্তু) অত্যশ্নতঃ (বেশী ভোজনকারীর) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না); ন চ একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত নিরাহারীরও হয় না); অতি স্বপ্নশীলস্য চ ন (অত্যন্ত নিদ্রাবিলাসীরও হয় না); জাগ্রতঃ এব চ ন (অতি জাগরণশীল ব্যক্তিরও হয় না)।

হে অর্জুন, কিন্তু যিনি অতি ভোজনকারী অথবা একান্ত ভোজন বিমুখ, তার যোগ হয় না; অতিশয় নিদ্রাশীল স্বভাব অথবা অতিরিক্ত জাগরণশীল স্বভাব ব্যক্তিরও যোগ হয় না। **নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ**—এখানে শ্রুতি অনুযায়ী আত্মপরিমিত ভোজনের কথা বলা হয়েছে। আত্মসংমিত অন্ন অপেক্ষা অল্পও শরীর রক্ষণের অনুপযোগী, আবার সংমিত পরিমাণের অধিক অন্নও যোগের বিঘ্ন ঘটায়, সেজন্য ভগবান এখানে যোগীর আহারের নিয়ম বলে যাচ্ছেন (শঙ্করাচার্য)।

পূরয়েদশনেনার্দ্ধং তৃতীয়মুদকেন তু।
বায়োঃ সঞ্চরণার্থায় চতুর্থমবশেষয়েৎ ॥

ইত্যাদি বাক্যাদি শত পথ শ্রুতি উক্ত এই পরিমিত ভোজন যোগের একান্ত সহায়ক (হনু, আনন্দগিরি)। এখানে যোগাভ্যাসকারীর ভোজনের বিবিধ পদ্ধতির কথা বলেছেন—অতি আহারও চলবে না আবার অনাহারী থাকা চলবে না (রামানুজ, শ্রীধর, বলদেব, নীলকণ্ঠ, বিশ্বনাথ)। অপরিমিত অন্ন ভোজন জীর্ণ হতে অধিক সময় লাগে এবং যোগে বিঘ্ন হয়, আবার অতি অল্প ভোজনেও শরীর শীর্ণ ও দুর্বল হেতু যোগের ব্যাঘাত হয়, সেজন্য ঠিক আত্মসম্মিত ভোজন করবে (মধুসূদন)। সংসার ত্যাগ, কর্মত্যাগ এগুলি গীতার লক্ষ্য নয়। শরীরকে কষ্ট দিয়েও যোগ হয় না আহার নিদ্রা কর্মাদি সকল ব্যাপারে ত্যাগ পন্থা শ্রেয় নয়, আবার অতিরিক্ত করাও নিয়ম নয় (শ্রীঅরবিন্দ), অতি আহার এবং একেবারে অনাহার যোগের বিঘ্ন ঘটায় এবং পরিমিত আহারই যোগ নয় যোগের অনুকূল মাত্র (যোগানন্দ), অতি ভোজনে শরীরে ধাতুর বিকারে শক্তির হানি ও পবিত্রতার হানি হয়, আবার নিতান্ত অনাহারে ক্ষুধার তাড়নায় চিত্তবৃত্তি একাগ্র হয় না, দুর্বলতার সৃষ্টি করে যোগের বিঘ্ন ঘটায়।

**ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন**—অতি নিদ্রালু ব্যক্তির যোগ হয় না, কেননা নিদ্রাই অতি শীঘ্রই আক্রান্ত হওয়ায় মনে যোগ হয় না। আবার অতি জাগরণশীলেরও অতি অনিদ্রা হেতু ক্লান্ত মস্তিষ্কে যোগ হয় না।

গীতায় যোগে মধ্যপথ অবলম্বন করতে বলেছেন; সর্ব্বত্র অত্যন্তম গর্হিতম। অতি ভোজনে অজীর্ণ হেতু শরীর দুর্বল হয়ে যায়—উদর স্ফীত হয় মন জড়ত্ব প্রাপ্ত হয়, পশুত্ব প্রাপ্ত হয়; শরীরের সমস্ত energy নষ্ট হয়ে যায় খাবার হজম করতে, এজন্য অতি ভোজনে যোগাভ্যাস সম্ভব হয় না; আবার অতি অনশনও ভাল নয় তাতে দেহ ক্ষীণ হয়ে যায়, দুর্বল হয়ে যায় আবার কখনও বা দেহ মন ভোজনের জন্য আকুল হয় কখনও বা মস্তিষ্কের স্নায়ুগুলি শুকিয়ে যায়—এই অবস্থায় অষ্টাঙ্গ যোগের নিরন্তর ধ্যান ইত্যাদি সম্ভব হয় না, তাই মাঝামাঝি পথে চলাই উচিৎ। বুদ্ধদেবও মধ্যপথ অবলম্বন করতে বলেছেন।

আবার অতি নিদ্রাও যেমন তমোগুণ বাড়িয়ে দেয় মনকে আচ্ছন্ন করে, কোন উচ্চচিন্তা সম্ভব হয় না বিশেষ করে নিদ্রালু স্বভাবে মনের একমুখী চিন্তাবৃত্তিই নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি একেবারে নিদ্রাহীনতাও যোগের পরিপন্থী, অতি অনিদ্রায় পাগল হবার সম্ভাবনা তাছাড়া মন রুক্ষ হয়ে যায়—ধ্যান বা যোগাভ্যাসের স্নিগ্ধতা আসে না। উচ্চ আধ্যাত্মিক চিন্তাও সম্ভব হয় না (বেদব্যাস)।

যোগীর দিবাভাগ জাগরণ ও রাত্রির প্রথম ও চতুর্থ প্রহরে জাগ্রত অবস্থায় যোগাভ্যাস প্রয়োজন, কেবল রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে নিদ্রার প্রয়োজন (কৃষ্ণানন্দ)।

# পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ ও তৎসম্পর্কিত আলোচনা

শ্রীহিমাদ্রিশেখর দত্ত

আমরা সকলেই মাঝে মাঝে সাধারণভাবে বলে থাকি যে, আমরা নাকি পৃথিবীর মধ্যে বাস করি। কিন্তু কথাটা একেবারেই ঠিক নয়। আমাদের চারিদিকের গাছপালা, বাড়ীঘর, সমুদ্র-পাহাড় সবকিছু, এমনকি আমরা নিজেরাও পৃথিবীর উপরিতলে বাস করি। পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও পর্যন্ত খুব বেশী মানুষের কাছে জানা নয়। কারণ সোজাসুজি যেমন মহাশূন্যে উড়ে যাওয়া যায়, সেই রকম সোজাসুজি কোন ভাবে পৃথিবীর মধ্যে ঢুকে যাওয়া যায় না। পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ যেখানে ৪০০০ মাইল, মানুষ সেখানে কেবলমাত্র খুঁড়ে ১৭ মাইল পর্যন্ত পৌঁছতে পেরেছে। অবশ্য কিছু কিছু পেট্রোলিয়ামের খনির গড় গভীরতা ৩·১ মাইল। কিন্তু ঐ ৩১ মাইল পর্যন্ত তো আর মানুষ যাচ্ছে না, গেছে খনির তলদেশ থেকে তেল তুলে আনার জন্য লোহার নলগুলি। ভারতবর্ষের গভীরতম খনি হল মহিশূরের কোলার স্বর্ণখনি যার গড় গভীরতা ১০০০ ফিট। এই সমস্ত গভীরতাগুলো পৃথিবীর ব্যাসার্ধের তুলনায় এতই সামান্য ( ৪০০০ মাইল ) যে, পৃথিবীর ভেতরটা কেমন এ সম্বন্ধে কোন রকম কৌতূহল মেটানো একেবারেই অসম্ভব। সেইজন্য বিজ্ঞানীরা কিছু কিছু পরোক্ষ ( Indirect ) ব্যবস্থা নিয়েছেন যার থেকে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ সম্বন্ধে মোটামুটি একটা ধারণা হতে পারে। সেই সমস্ত ব্যবস্থাগুলোর মধ্যে সব থেকে প্রয়োজনীয় এবং সঠিক ব্যবস্থা হলো ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় উপাত্তসকল (Data from seismology)।

সমস্ত পৃথিবীকে গভীরতার সাপেক্ষে তিনটি স্তরে (layer) ভাগ করা যায়। যথা, ভূ-ত্বক (crust), আভ্যন্তরীণ ভূ-ত্বক (mantle) এবং অন্তঃস্থল (core)। বলাবাহুল্য যে, এই গভীরতা সাপেক্ষে বিভাগগুলি করা হয়েছে ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় উপাত্তসকল থেকে। আমরা সকলেই ভূ-ত্বকের উপরে থাকি। পৃথিবীতে যাবতীয় কিছু যেমন ঘরবাড়ী, গাছপালা, সমুদ্র, পাহাড়, নদনদী সবই এই ভূ-ত্বকের উপর বিরাজমান।

কিন্তু কেমন করে এই বিভাগগুলো স্থির করা গেলো অর্থাৎ তিনটি বিভাগের মধ্যে গভীরতা ছাড়া মূলগত এমন কি পার্থক্য থাকতে পারে যার জন্য সমস্ত পৃথিবীতে তিনটি স্তর আছে বলে বলা হচ্ছে। বলাবাহুল্য যে ভূ-ত্বক, থেকে গভীরতা ক্রমশঃ বেড়ে বেড়ে অন্তঃস্থল (core) পর্যন্ত গেছে।

এখনে প্রথমে ভূমিকম্প (Earthquake) সম্বন্ধে কিছু বলে রাখা প্রয়োজন। ভূমিকম্প বলতে বিজ্ঞানের ভাষায় কি বোঝায়? পৃথিবীর অভ্যন্তরে যদি কোন কারণে শিলাসকল তার নিজস্ব অবস্থান থেকে চ্যুত হয় তাহলে ঐ চ্যুতির ফলে পার্শ্বস্থ শিলাসকলের মধ্যে যে কাঁপনের সৃষ্টি হয়, সেই কাঁপনেরই আর এক নাম ভূমিকম্প। এখন এই কাঁপন সকল শিলা থেকে শিলায় তরঙ্গের (wave) আকারে ছড়িয়ে পড়ে, ঠিক যে রকম শান্ত জলাশয়ে একখণ্ড ঢিল ফেললে দেখা যায়। এখন এই কাঁপনগুলোর গতিবেগ (velocity) শিলাসকলের ঘনত্ব এবং আপেক্ষিক গুরুত্ব (density and specific gravity) এর উপর নির্ভর করে। গতিবেগের ভিত্তিতে কাঁপনগুলো (vibrations) কে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যায়। যথাক্রমে P-তরঙ্গ এবং S-তরঙ্গ। এই দুই প্রকার তরঙ্গের সাহায্যেই পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে খবর সকল সংগ্রহ করা গেছে। প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি এক একবার করে ভূমিকম্প হবে আর আমরা পৃথিবীর ভিতরকার খবর সংগ্রহ করব? ভূমিকম্পতো আর রোজ হচ্ছে না। তাহলে?

এক্ষেত্রে বিজ্ঞান আমাদের সহায়তা করেছে। আমরা বিস্ফোরণের সাহায্যে কৃত্রিম ভূমিকম্প (Artificial Earthquake) তৈরী করতে পারি। তারপর সেই ভূমিকম্পজাত তরঙ্গ সকলের (P-তরঙ্গ এবং S-তরঙ্গ) গতিবেগের তুলনামূলক আলোচনা করে পৃথিবীর গভীরতর প্রদেশে কোথায় কি প্রকারের শিলাসকল বিরাজমান অথবা কোথায় কি প্রকারের অবস্থা (State) তা জানতে পারি। কারণ আমরা জানি শিলা সকলের প্রকার ভেদে তরঙ্গ সকলের গতিবেগের তফাত হবে। সবশেষে যদি গভীরতা গতিবেগ লেখ (Depth-Velocity Graph) আঁকা যায় তবেই একটা সম্পূর্ণ ধারণা করা সম্ভব হবে।

এবার আবার পূর্বের আলোচনায় ফিরে আসা যাক। যুগোস্লোভিয়ার মোহোরোভিসিক (Mohorovicic) নামে একজন ভূবিজ্ঞানী এই ভূমিকম্পজাত তরঙ্গ সকলকে কাজে লাগিয়ে পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ সম্বন্ধে জানার চেষ্টা করেন। তাঁর পরীক্ষায় তিনি দেখেন যে P-তরঙ্গের গতিবেগের এক বিরাট তফাত হয়ে যাচ্ছে যখনই সে গভীরতা ৩৫-৪০ কি. মি. ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ৩৫ কি. মি. পর্যন্ত P-তরঙ্গের গতিবেগ যখন ৬ কি. মি./সেকণ্ড তখন ঠিক তার পরেই গতিবেগ বেড়ে ৭ কি.মি./সেকণ্ড হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন যে, ৩৫ কি. মি.-এর পর শিলাসকলের উপাদানের (Constituent) পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে। আরও সোজাভাবে বললে ৩৫ কি মি. পর্যন্ত যে প্রকার শিলা সকল পাওয়া যায়, তার বেশী গভীরতায় তদ্রূপ শিলা পাওয়া যায় না। তাই P-তরঙ্গের গতিবেগের এইরূপ বিরাট তফাত হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ৩৫ কি. মি.-এর পর থেকে পৃথিবীর সাংগঠনিক উপাদান (Compositional Constituent) তৎপূর্ববর্তী উপাদানের সহিত এক নয়। তাই ৩৫ কি. মি. গভীরতায় একটা বিচ্ছেদ রেখা (Discontinuity Line) টেনে দেওয়া হল। উপরিভাগের নাম হল ভূ-ত্বক (Crust) এবং নিম্নভাগের নাম আভ্যন্তরীণ-ভূত্বক (Mantle)। সুতরাং গভীরতা ছাড়া মূলগত পার্থক্য হলো দুটির মধ্যে উপাদানের তফাত। পরে আরও নিখুঁত (Detailed) ভাবে পরীক্ষার ফলে ভূ-ত্বকের মধ্যেও একটি বিচ্ছেদরেখা টানা সম্ভব হয়েছে। অর্থাৎ সমগ্র ৩৫ কি. মি. গভীরতাকে দুটি নতুন স্তরে (Layer) ভাগ করে দেওয়া গেছে। কোনও কোনও স্থানে দেখা গেলো যে ২০ থেকে ৩০ কি. মি. এর মধ্যে ভূ-ত্বকেই P-তরঙ্গের গতিবেগের তফাত হচ্ছে এই তফাতটা প্রথম নজরে আসে কনরেড (Conred) নামে একজন বিজ্ঞানীর। তাই যখন ২০ থেকে ৩০ কি. মি. এর মাঝামাঝি একটা বিচ্ছেদরেখা টানা হলো তখন সেই রেখার নাম দেওয়া হল কনরেড বিচ্ছেদ রেখা। সেইরূপ ভূ-ত্বকও আভ্যন্তরীণ ভূত্বকের মধ্যবর্তী সীমারেখাকে ঐ রেখার আবিষ্কারক মোহোরোভিসিকের নাম অনুসারে সংক্ষেপে মোহো (Moho) বলা হয়। কনরেড বিচ্ছেদ রেখার উপরিস্তরের নাম দেওয়া হল সিয়াল স্তর (Sial Layer) এবং নিচের স্তরের নাম দেওয়া হল সিমা স্তর (Sima Layer)। উপরিস্তরের মূল উপাদান হল সিলিকন্ এবং অ্যালুমিনিয়াম এবং নীচের স্তরের মূল উপাদান সিলিকন এবং ম্যাগনেসিয়াম সুতরাং ভূত্বকের ( Crust ) দুটি বিভাগ। একটি সিয়াল (Sial) এবং অন্যটি সিমা ( Sima )।

ভূ-ত্বকের পরই আসে আভ্যন্তরীণ ভূত্বক (Mantle)। ভূমিকম্প ও তৎসম্পর্কিত তরঙ্গ সকলের (P-তরঙ্গ এবং S-তরঙ্গ) গতিবেগের বৈচিত্র্য অনুসারে আভ্যন্তরীণ-ভূত্বকের মধ্যেও দুটি বিভিন্ন স্তরের সন্ধান পাওয়া গেছে, যাদের সাংগঠনিক উপাদান বিভিন্ন। এই দুটি স্তরের একটি হল ৪০০ কি. মি. গভীরতায় এবং অন্যটি হল ১০০০ কি. মি. গভীরতায়। সুতরাং ৩৫ কি. মি থেকে ৪০০ কি. মি. পর্যন্ত মোটামুটি তরঙ্গ সকলের গতিবেগের খুব একটা তফাত হয় না। কিন্তু ৪০০ কি. মি. এর পর থেকে ১০০০ কি. মি. পূর্ব পর্যন্ত গতিবেগ সকল পূর্বের স্তর থেকে ভিন্ন। আবার ১০০০ কি. মি. এর পর গতিবেগ ৩৫ কি. মি. থেকে ৪০০ কি. মি এর মতই যতক্ষণ না গভীরতা ২৯০০ কি. মি. এ এসে পৌঁছয়। ২৯০০ কি. মি. এর পর আর S-তরঙ্গ যেতে পারে না এবং P-তরঙ্গেরও গতিবেগ হঠাৎ ভীষণ ভাবে কমে যায়। ২৯০০ কি. মি. এর বিচ্ছেদ রেখাকে বলা হয় গুটেনবার্গ বিচ্ছেদরেখা (Gutenberg

Discontinuity Line)। ৪০০ কি. মি. থেকে ১০০০ কি. মি. এর মধ্যবর্তী স্থানকে বলা হয় পরিবর্তনসূচক স্তর (Transitional Zone): ২৯০০ কি. মি. এর পর যেহেতু S-তরঙ্গ আর যেতে পারে না তাই বিজ্ঞানীরা মনে করেন পৃথিবীর বহিঃঅভ্যন্তর ভাগ অন্ততঃপক্ষে ২৯০০ কি. মি. থেকে ৫০০০ কি, মি. পর্যন্ত এখনও তরল অবস্থায় আছে। কারণ S-তরঙ্গ কখনও তরলের মধ্যে দিয়ে যেতে পারে না, এটা প্রমাণ করা যায়। তাই ২৯০০ কি. মি. পর্যন্তই আভ্যন্তরীণ তৃত্বক (Mantle) ধরা হয়। তারপর থেকে শুরু হয়েছে অন্তঃস্থল (Core)। কোনও কোনও ভূবিজ্ঞানীর মতে অন্তঃস্থলেরও দুটো বিভাগ আছে। যথাক্রমে বহিঃঅন্তস্থল ( Outer Core ) এবং অন্ত অন্তঃস্থল ( Inner Core )। ২৯০০ কি. মি. থেকে ৫০০০ কি. মি. পর্যন্ত স্থানকে বহিঃঅন্তস্থল হিসাবে তাঁরা ধরেন। ৫০০০ কি. মি. এর পর থেকে শুরু হয়েছে অন্ত'অন্তঃস্থল। অন্তস্থলের (Core) মূল রাসায়নিক উপাদান (Chemical Constituents) হল নিকেল (Ni) এবং আয়রন (Fe)। তাই এই স্তরের অন্য নাম Nife ও বটে

সুতরাং সমস্ত আলোচনাকে যদি আমরা একটা তালিকারূপে প্রকাশ করি তার তালিকাটা নিচের মত হবে। তালিকাটা চোখে পড়লেই সঙ্গে সঙ্গে বোঝা যাবে পৃথিবীর কত গভীরে কিরূপ স্তর রয়েছে।

| | স্তর সকলের বিবরণ | গভীরতা |
|---|---|---|
| তৃ ত্বক (Core) | সিয়াল ( Sial ) | |
| | কনরেড বিচ্ছেদ রেখা | ৩৫ কি. মি. |
| | সিমা (Sima) | |
| — \| — \| — \| — | \| — \| — \| — \| — \| — \| — \| — মোহো রেখা | —৩৫-৪০ কি. মি. |
| আভ্যন্তরীণ তৃত্বক (Mantle) | ঊর্দ্ধ-আভ্যন্তরীণ তৃত্বক ( Upper mantle ) | |
| | — | —৪০০ কি. মি |
| | পরিবর্তন সূচক স্তর (Transitional Zone) | |
| | | —১০০০ কি. মি. |
| | নিম্ন-আভ্যন্তরীণ তৃত্বক (Lower Mantle) | |
| — \| — \| — \| — | — \| — \| —গুটেনবার্গ বিচ্ছেদ রেখা— \| — \| — \| | —২৯০০ কি. মি. |
| | বহিঃঅন্তস্থল (Upper Core) | |
| অন্তস্থল ( Core) | | —৫০০০ কি. মি. |
| | অন্ত'-অন্তঃস্থল (Lower Core) | |

আমাদের আলোচনা আপাততঃ এখানেই শেষ করছি। পরে সুযোগ হলে প্রত্যেকটি স্তর নিয়ে বিশদ আলোচনার ইচ্ছে রইল।

# অপরূপ

শ্রীসুনাথ মুখোপাধ্যায়

মহাকাশে বাতাসেতে সিন্ধুর সলিলে,
শুধু মধু শুধু মধু মধু এ ভূতলে।
প্রণবের সুর-লয় ওঁকার মূরতি
দেহ-মন-প্রাণময় অখণ্ড বিভূতি।

মহানন্দ-সুধাপানে হে শিব সুন্দর,
রূপ ভেদে ভ্রমিতেছ যুগ-যুগান্তর।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।

জীবনের সাগরেতে অমৃত মথনে,
দুঃখ-সুখ তরঙ্গের উত্থান-পতনে,
যে বা পাই যে না পাই মিলিয়া মিশিয়া,
সকলেই সব পাই হিয়া মাঝে হিয়া।
মিলনের এ মেলায় একই বাউল,
সবারেই সে মাতায় নাই তার ভুল।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।

চিরন্তন বাক্য-মন-অনাগত রূপ,
যত সেথা শিল্পী কবি-মানস-মধুপ।
বিজ্ঞানীর আদিবিক উৎস-প্রধান,
আলোকের বর্ণলোকে শুভ্রদীপ্তিমান্।
যত রূপ-গুণময় ভূত-আবরণ,
আসে যায় দুটী পথে জনম-মরণ।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।

ক্ষুদ্রচেতা বন্দী হয় স্বার্থ-কারায়,
আপনার হিংসানলে নিজেরে পোড়ায়।
মদমত্ত অসুরের উন্মত্ত উল্লাস,
ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা আসুর সন্ত্রাস।
তারি মাঝে মৃত্যুহীন মরণ বরণে,
কত প্রাণ মহাপ্রাণ সবার কারণে।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।
নগণ্য বা গণ্য কেহ, কেহ পিতামাতা,
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু কেহ ভগ্নীভ্রাতা।
যুগে যুগে আবির্ভূত যুগ-অবতার,
গ্লানিমুক্ত ধর্মরাজ্যে সাধুর উদ্ধার।
চক্রসাথে চক্র জোড়া ষড়চক্রযান,
অপরূপ সহস্রার সমাধি-সন্ধান।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।

পরিধির পরিক্রমা কভু সেথা ক্লান্তি,
ব্যাসার্দ্ধের উৎস বিন্দু কেন্দ্রীভূত শান্তি।
ব্রহ্ম হ'তে তৃণদলে সকলের ঠাঁই,
অপরূপ রাজ্যে তব কেহ বাদ নাই।
এ মিলন-নিত্যলীলা নিত্য মধুময়,
অপরূপ শান্তিময় অরূপের জয়।
এই মেলা এই খেলা এরই আড়ালে,
অপরূপ সব রূপ অরূপ-অতলে।

# অভেদ উৎসব

## স্বামী হীরানন্দ

পরমগুরু শ্রীমৎ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ১১২তম পুণ্য আবির্ভাব স্মরণে বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে গত ৬ই অক্টোবর '৭৭, বৃহস্পতিবার প্রত্যুষে মাঙ্গলিক সানাইয়ের সূচনা হ'ল তিনদিনব্যাপী মহোৎসবের। সকালে ঠাকুরের মূল মন্দিরের আরতির পর আশ্রমের সাধু ও ভক্তেরা কাশীপুর মহাশ্মশানে গিয়ে আরতি ও ভজন গান সহ স্বামীপাদের সমাধিতে মাল্যদান ও অর্ঘ্য নিবেদন করে এসে গঙ্গার ধারে ঠাকুরের মন্দির বারান্দায় শ্রীশ্রীঠাকুর ও অভেদানন্দজীর পুষ্পমালো সুসজ্জিত মূর্তির সামনে বসলেন সকলে পাঠচক্রের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে। ঠাকুরের লেখা অভেদপ্রশস্তি "বিশ্ববীণার মোহন মন্ত্রে বাজালে অভেদমন্ত্র" গেয়ে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করলেন স্বামী অরূপানন্দজী। উদ্বোধন ভাষণে পূজ্যপাদ সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দজী স্বামীপাদের স্বাধ্যায় ও পঠনপাঠনের প্রতি তীব্র অনুরাগের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পরমগুরু মহারাজের আদর্শ স্মরণেই প্রতি বছর আমরা এই পাঠচক্রের অনুষ্ঠান করে আসছি। আজ তাঁর পুণ্য জন্মদিনে তাঁর চরণে আমাদের প্রণাম নিবেদন করে প্রার্থনা জানাই যে, তিনি কৃপা করে আমাদের তাঁর আদর্শ পথে এগিয়ে নিয়ে চলুন। স্বামীজীর ভাষণের পর সুরু হয় স্বামীপাদের ও শ্রীশ্রীঠাকুরের রচনা, গীতা, কথামৃত ও আশ্রমের অন্যান্য দিব্যগ্রন্থ থেকে অংশ বিশেষের পাঠ। পূজনীয় সঙ্ঘসচিব স্বামী সম্বুদ্ধানন্দজীও পাঠে অংশ গ্রহণ করে সকলকে অনুপ্রাণিত করেন। পাঠচক্রের পর স্বামীপাদের বিশেষ পূজা আরতি, পুষ্পাঞ্জলি, হোম ও নামকীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। পূজান্তে মধ্যাহ্নে বহু ভক্ত ও দরিদ্র নারায়ণ অন্নপ্রসাদ পেয়ে পরিতৃপ্ত হন।

উৎসবের দ্বিতীয় দিনের আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান ছিল বিকেলে নাটমন্দিরে ঠাকুর সত্যানন্দদেব রচিত স্বামী অভেদানন্দের পূতজীবন অবলম্বনে "বেদশীর্ষ অভেদানন্দ" গীতি-আলেখ্য ও স্বামীপাদের জীবনবেদ আলোচনা। অনুষ্ঠান সুরু হবার মুখে মুখে নিভে গেল আলো। লোডশেডিং-এ আঁধার হয়ে গেল বরানগর। তবু অভেদ-উৎসব অনুষ্ঠান বন্ধ হল না। ছাদের মিষ্টিক আলোয় গীতি-আলেখ্য বেশ ভালই জমে উঠেছিল। আলেখ্যটী পাঠ করেন স্বামী বোধানন্দ। সঙ্গীতাংশে অংশ নেন স্বামী মৃগানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ, শ্রীশম্ভু রায় চৌধুরী প্রভৃতি সাধু ও ভক্তগণ। ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য যুগপৎ কণ্ঠদান ও তবলাসঙ্গত করে সহযোগিতা করেন আগাগোড়া। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শ্রীঅখিল নিয়োগী, যিনি 'স্বপনবুড়ো' নামে সর্বজনে বিশেষ পরিচিত। তিনি এসেছিলেন সস্ত্রীক।

গীতি-আলেখ্যর পর **শ্রীঅখিল নিয়োগী** স্বামীপাদের জীবনবেদ নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, স্বামী অভেদানন্দের মন্ত্রশিষ্য শ্রীসত্যানন্দদেব এমন এক মহাপুরুষ যাঁর কাছে গেলে ক্ষণকালের জন্যও আমরা বর্তমান পৃথিবীকে ভুলে যাই। তিনি সবাইকে বলতেন ফুলের মত সুন্দর হও। এখানে এলে তাঁর পুণ্য-প্রভাব অনুভব করি। আজ তিনি অপ্রকট, কিন্তু আমি বিশ্বাস করি তাঁর পুণ্য প্রভাব এই আশ্রমকে ঘিরে রয়েছে। কাজেই এখানে উপস্থিত হওয়া ভাগ্যের কথা। আমরা সহরে বাস করি—কলকাতার মত সহরে—কিন্তু সেখানে ঠিক যেন কীটের মত থাকি। এই অনুষ্ঠানের একটু আগেই এখানকার এক স্বামীজীর সঙ্গে আলোচনা হচ্ছিল যে, কলকাতাকে এখন সব রকমে কলুষ আবহাওয়া ছেয়ে ফেলেছে। অথচ এই মহানগরী কলকাতাতেই পুণ্যশ্লোক রামকৃষ্ণ, অভেদানন্দ, স্বামী সত্যানন্দ ও আরও কত শত সাধু সন্ত এসেছেন—তাঁদের দিব্য ভাবধারার পুণ্যপ্রবাহ বয়ে গেছে জগতের দিকে দিকে এই কলকাতার বুকের ওপর দিয়েই। কলুষপঙ্কে নিমজ্জিত আজকের কলকাতার দিকে তাকিয়ে সেকথা মনে করাই যেন কষ্টকর। এই যে এত সুন্দর দিব্য

অনুষ্ঠান এখানে হচ্ছে—আলো নিভে গেল। কলকাতার এ অবস্থা কত দিন থাকবে কে জানে। এর চেয়ে দুঃখ বেদনার কথা আর কি হতে পারে। ছেলেবেলার একটি কবিতা মনে পড়ছে—বহু পুণ্য বলে জন্ম নর এ ভারতে/আছে বিমিশ্রিত এর প্রতি জলকণে/সাধুর পবিত্র অস্থি সতীর শোণিত/কিন্তু কর্মগুণে যদি নাহি পার উজলিতে মাতৃভূমি মুখ/বৃথাই জনম তব। তখন ছেলে বেলায় এসব কবিতা আমাদের মুখস্থ করানো হ'ত। স্বামী অভেদানন্দের জীবন আলোচনা করতে গিয়ে এসব মনে জাগে।

এরপর শ্রীনিরোদী স্বামীপাদের জীবনবেদ আলোচনা প্রসঙ্গে পিতামাতার আকাঙ্ক্ষা যে, কালীপ্রসাদ দশজনের একজন হোক, কিশোর কালীর বুকে পরমকে পাওয়ার অসীম ব্যাকুলতা অনুভব, শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের মাঝে মনের মানুষকে খুঁজে পাওয়া, প্রাণচেলে ঠাকুরের সেবা, ঠাকুরের দেহান্তে কঠোর তপস্যা, কপর্দকশূন্য হয়ে সারা ভারত ভ্রমণ করে ভারতভূমির পরিচয় গ্রহণ, বিবেকানন্দের আহবানে ইংলণ্ড গমন ও পাশ্চাত্যে দীর্ঘ ২৫ বছর বেদান্ত প্রচার, জীবনের আলৌকিক ঘটনা, পরলোক রহস্য নিয়ে গবেষণা, ভারতে এসে বেদান্ত প্রচার, সুভাষ বসু প্রভৃতি মহামনীষীদের তাঁকে দর্শন করতে আসা ইত্যাদি বহু দিক নিয়ে সুন্দর আলোচনা করে শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখেন।

উৎসবের শেষ দিন শনিবার সন্ধ্যায় কবি ও সুধী সম্মেলনের অনুষ্ঠানটী বোধ করি এবারের সবচেয়ে সুন্দর অনুষ্ঠান। এবার সম্মেলন যথারীতি হল ঘরে না হয়ে ঠাকুরের মন্দির বারান্দায় অনুষ্ঠিত হয়। ফলে মণিমন্দির আঙিনায় সারি সারি বেঞ্চে বসে বহু শ্রোতার অনুষ্ঠানটী উপভোগের সহজ সুযোগ ঘটে যায়। শ্রীশ্রীঠাকুর, পরমগুরু মহারাজ ও কবি সুধীবৃন্দকে বন্দন এবং "সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্" গানে স্বামী অরূপানন্দের কণ্ঠে উদ্বোধন সঙ্গীতের পর সঙ্ঘপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্বেদানন্দজী তাঁর উদ্বোধন ভাষণে ঠাকুর সত্যানন্দদেব ও পরমগুরু স্বামী অভেদানন্দকে প্রণাম ও শুভাগত কবি সুধীগণকে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়ে বলেন, পরমগুরু স্বামী অভেদানন্দের জন্মোৎসবে একটি দিন ঠাকুর নির্দিষ্ট করে রেখেছিলেন কবি ও সুধী সম্মেলনের জন্যে। ঠাকুরের তিরোধানের পর দু বছর অনুষ্ঠানটি হয়নি। তারপর থেকে আবার সুরু হয়েছে এই অনুষ্ঠান। এর উদ্যোক্তা আমাদের পরমবন্ধু শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক। তাঁরই উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় এই আশ্রম কবি কুলের দ্বারা, সুধীবৃন্দের দ্বারা আবার মুখরিত হয়ে উঠেছে। কবি সম্মেলন ঠাকুরের খুব প্রিয় জিনিস ছিল। তিনি নিজে ছিলেন স্বভাব কবি। চেষ্টা করে ঠাকুরকে কবিতা রচনা করতে হ'ত না, লিখতে হ'ত না। সব সময় মুখে মুখেই কবিতা রচনা করে শোনাতেন গোপালকে। গোপালকে নিয়ে পিছনের বাগানে সকাল সন্ধ্যায় বেড়াবার সময় শ্রীমুখ রচিত কবিতা অনর্গল বলে যেতেন আর যে সময় মায়েরা যারা কাছে কাছে থাকতেন তাঁরা কেউ এক লাইন কেউ আর এক লাইন করে ধরে রাখতেন। পরে সেগুলি লিখে নিয়ে ঠাকুরকে দেখিয়ে নিয়ে পঠিত হ'ত গোপালের সামনে। ঠাকুর বলতেন সব হি চিজ্ গোপালকা—সব জিনিসই গোপালের, সব হি রচনা গোপালকা—সব রচনাই গোপালের। গোলাপ ফুল ঠাকুর খুব ভালবাসতেন। কেউ হয়ত রাশিকৃত গোলাপ ঠাকুরের কাছে নামিয়ে দিয়েছে। ঠাকুর সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি গোপালের চরণে দিয়ে বলতেন—সব হি গোলাপ গোপালকা। এইভাবে গোপালময় হয়ে ছিলেন চিরকাল। প্রায় কবিতাই ঠাকুর extempore বলে যেতেন, লিখে নিতেন মায়েরা। তারই একটি নমুনাস্বরূপ পড়ে শোনাচ্ছি এখন—কবিতাটির নাম "জুতাসের হোক রূপান্তর"*।

স্বামীজীর জলদ কণ্ঠে ঠাকুরের কবিতাটির অপূর্ব আবৃত্তি শুনে কবি সুধী শ্রোতা সকলেই মুগ্ধ হয়ে যান। আবৃত্তি শেষে স্বামীজী শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক মহাশয়ের ওপর সভার পৌরহিত্যের ভার অর্পণ করেন।

পরমব্রহ্মের জ্যোৎস্নাধার সঙ্ঘপতিত্বে কবিগণ এবার অভেদ চরণে শ্রদ্ধা জানাতে কাব্য অর্ঘ্যের ডালি নিয়ে এগিয়ে এলেন একে একে। প্রথমেই স্বামী মৃগানন্দ পাঠ করে শোনালেন পূজনীয়া শ্রীঅর্চনা মার দুটী কবিতা—"যৌবনের লগ্নে" ও

* সমগ্র রচনাবলী—স্বামী সত্যানন্দ, ৪র্থ খণ্ড, 'অমর বল্লী', পৃঃ ১২২

"সেদিন আসছে"। কবিতা দুটীর দিব্যগভীর ভাব ও ভাষার অভিব্যক্তি ঠিক ঠিক ছন্দ সুরে বেঁধে ওঠায় সবার অন্তরকে স্পর্শ করে বিশেষ ভাবে। পূজনীয়া শ্রীশরণাপুরার "স্বামী অভেদানন্দ" কবিতাটিও খুবই ভাবগম্ভীর। এরপর স্বামী বোধানন্দ, স্বামী অরূপানন্দ ও স্বামী মৃগানন্দ স্বরচিত কবিতা পাঠ করে সকলকে আনন্দ দান করেন। আজকের কবিতা পাঠের পর শ্রীকালিকিঙ্কর সেনগুপ্ত, কবিকঙ্কন হেমন্ত কুমার বাগচী, শ্রীমতী বেলা দেবী, শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক, শ্রীইন্দু মল্লিক, শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী, শ্রীগোপালদাস কাব্যভারতী, শ্রীঅনিল কুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক প্রভৃতি কবিগণ একে একে স্বরচিত কবিতা পাঠ করে এক অপূর্ব কাব্যময় পরিবেশ সৃষ্টি করে তোলেন। জ্যোৎস্নাদা দুটী কবিতা পাঠ করেন "ভাগ্যের দেখা" ও "দেখার ভাগ্য"। দুটী কবিতারই অপূর্ব ভাবমোহনা। সুবেশুলর গোপাল নিয়ে আধুনিক কবিতাও সকলকে মুগ্ধ করে। রমেনদার "নীলকণ্ঠ"ও কম না। শ্রীকালিকিঙ্কর বাবুর কবিতা ও ভাষণ—এরই ভেতর বেশ একটু বৈচিত্র্যের আস্বাদ নিয়ে গেল। বেলা দেবীর "মহাজীবন" আর "পরিচিতায়" কবিতা দুটির মধ্যে শেষোক্তটির ভাব মাধুর্য্য সত্যি অপূর্ব। কার নাম করবো আর কার করবো না। বলতে কি, আজকের অনুষ্ঠানে পঠিত প্রত্যেক কবির প্রতিটি কবিতাই ছিল ভাব ভাষা ও ছন্দ বৈচিত্র্য নিয়ে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল।

সব শেষে **শ্রীদীপেন রাহা** অভেদ স্বামীর জীবনবেদ আলোচনা প্রসঙ্গে বৈশবে স্বামীপাদের ওপর তাঁর পিতামাতার প্রভাব বিশেষ ক'রে ভক্তিমতী শুদ্ধাচারী মাতা নয়নতারার প্রভাবের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে, ঠাকুরের কাছে তাঁর কৃপালাভ, তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বোধে ঠাকুরের রাধা ভাবের উদ্দীপন, তাঁর work is worship-এর আদর্শের কথা, পঞ্চপ্রদীপে আরতির তাৎপর্য বিষয়ে তিনি যা বলেছেন ইত্যাদি বিষয় নিয়ে সরল সরস আলোচনা করেন। পরিশেষে শ্রীরাহা বলেন, বিশ্বপ্রেমিক অভেদানন্দজী মনে প্রাণে বাঙালী ছিলেন এবং স্বাধীনতা প্রিয় ছিলেন। তাঁর কাছে মোক্ষলাভ শুধু আধ্যাত্মিক মোক্ষ ছিল না। জাগতিক, রাষ্ট্রিক, সামাজিক, বিদ্যা চারিত্রিক বিকাশ ইত্যাদি বিষয়েও স্বাধীনতার গুরুত্বের কথাই তিনি বলতেন। তাঁর শিক্ষা ও জীবনাদর্শ উত্তরসূরীদের মধ্যে সঞ্চার করতে হবে। ভারতের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সাধনার যে মহান আদর্শ এই সব মহাপুরুষরা দেখিয়ে গেছেন তা আমাদের গ্রহণ ও পালন করতে হবে। আশা করবো, ভারতের ধর্ম, শিক্ষা ও আদর্শ কখনও ব্যর্থ হবে না।

শ্রীরাহা তাঁর মনোজ্ঞ ভাষণ শেষে একটি স্বরচিত কবিতাও পাঠ করে শোনান। এরপর **শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত** মহাশয়কে স্বামীপাদ সম্বন্ধে কিছু বলতে অনুরোধ করলে তিনি দীপেনবাবুর ভাষণের জের টেনে বড় সুন্দর জ্ঞানগর্ভ আলোচনা উপহার দিলেন।

**শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত** বলেন, দীপেনবাবু স্বামী অভেদানন্দ সম্বন্ধে যা বলেছেন সেটুকু তাঁর ভারতবর্ষে অবস্থান কালের অংশ—তাই তার পরিশিষ্ট হিসেবেই দু' একটি কথা বলবো। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে জগদ্বিখ্যাত চিকাগো address এর পর ইংলণ্ডে এসে স্বামী বিবেকানন্দ খুঁজলেন আর একজন নির্ভর যোগ্য পাত্র যিনি পাশ্চাত্যে বেদান্ত প্রচারের কাজটি চালিয়ে যেতে পারেন। তিনি এ কাজের জন্য স্মরণ করলেন অভেদানন্দকে। এখান থেকেই সুরু হয় তাঁর পাশ্চাত্য দেশের বেদান্ত প্রচার ব্রত। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের যে রাখী বন্ধন স্বামী বিবেকানন্দ ক'রে যান সে সম্বন্ধ তিনি দীর্ঘ ২৫ বছর ধ'রে ওদেশে বেদান্ত প্রচার কর্মের মাধ্যমে বজায় রাখতে সক্ষম হন। ১৮৯৬ সালে তিনি প্রথম ইংলণ্ড এলেন। প্রথমে তাঁর আত্মপ্রত্যয় ছিল না। বক্তৃতা দেওয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন না, তার ওপর আবার ইংরেজদের মধ্যে ইংরাজীতে বক্তৃতা দেওয়া। স্বামীজী তাঁকে প্রাণ সঞ্চার করলেন। বললেন, তুই পারবি। স্বামীজী তাঁকে অনুপ্রাণিত করলেন। তারপর address এর পর address দিতে লাগলেন। পল ডয়সন, ম্যাক্সমূলার প্রভৃতি পাশ্চাত্য মহামনীষীদের সংস্পর্শে এলেন। ভারতের আধ্যাত্মিক উৎসের নির্ঝর "নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গে"র মত বেরিয়ে পড়ল ঝর ঝর। এখনও আমরা দেখতে পাচ্ছি পাশ্চাত্য দেশে বিভিন্ন ধর্ম ও ভাবের মাধ্যমে।

To think is to condition. Unconditional চিন্তা আমরা করতে পারি না। কোন চিন্তা করতে গেলে তার attributes চাই—নইলে চোখ বুঁজলেই অন্ধকার। যার জন্য গীতা বলেছেন—ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্ত চেতসাম্। এখানেই বলবো স্বামীজী সার্থক নামা। তিনি শুধু অদ্বৈতানন্দ নন তিনি দ্বৈতাদ্বৈতানন্দ।

একটা জিনিস যার জন্য পরমহংসদেবের অবতরণ করেছিলেন—"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত"—সেটা হচ্ছে জগৎ যেন এই বেদান্তের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা খুঁজে পাচ্ছিল না। যার জন্য বিদ্যাসাগরের মত অত বড় বিদ্যার সাগরও বেদান্তকে পাঠ্য থেকে বাদ দিয়েছিলেন। জগতটা যদি শুধু স্বপ্ন হয়, নেই হয়, তুমি স্বপ্ন দেখছো এ কোন্ বেদান্ত? এই যে মায়াবাদ এটা রামমোহন, রামকৃষ্ণ, রবীন্দ্রনাথ কেউ সমর্থন করেন নি। স্বামী বিবেকানন্দও একে সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন। জ্ঞানের মধ্যে যে জিনিস বিশেষ ভাবে যোগসূত্র বেঁধে দেওয়া, "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্' অর্থাৎ তাঁকে সর্বতোভাবে একত্বে পাওয়া যায় পৃথকত্বে পাওয়া যায়, বহুত্বে পাওয়া যায়। অনেকেই মনে করেন, বেদান্তে যেখানেই জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে সেখানেই বলা হয়েছে - জ্ঞানী হলেই তাকে ডুবে যেতে হবে, মিলিয়ে যাওয়া ছাড়া যেন তার আর পথ নেই, তাকে ব্রহ্মে লীন হয়ে যেতে হবে। Not at all. এটা compulsory নয় এটা বাধ্যতামূলক নয়। এটাই প্রতিষ্ঠান করবার সূত্র দিলেন এঁরা সব। মহাপ্রভুর যুগ থেকে আরম্ভ করে যাঁরা ভক্তিকে বিশেষ করে পথ দেখালেন তাঁদের মধ্যে স্বামী সত্যানন্দ, অদ্বৈতানন্দ অন্যতম। স্বামী সত্যানন্দ সব কিছুতেই জাগ্রত গোপালকে দেখেছেন। সব কিছুই গোপালের বলে জানতেন। মহাত্মা বিনোবাজী বলতেন, "সব তুমি গোপালকা"—এই যে প্রতি পদে পদে প্রত্যেক জিনিসে গোপালের উপলব্ধি এ ঐ "একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্"।

আমরা নিত্য ঘুমে ডুবে যাচ্ছি সম্পূর্ণ। সুষুপ্তির সঙ্গে সমাধিকে জ্ঞানীরা এক করেছেন। ঘুমে আমরা ব্রহ্ম সংস্পর্শ পাচ্ছি কিন্তু জেগে উঠছি। ঘুমের মধ্যে কোথায় ছিলাম তার কোন ঠিক নেই। ঘুমের আগেও কালীকিঙ্কর, ঘুমের পরেও সেই কালীকিঙ্কর তাতে তার সত্তা নষ্ট হচ্ছে না। তেমনি জ্ঞানেতে সমাধিতে লীন হয়ে যাও তাতেও অদ্বৈতানন্দ। জেগে ওঠ তাতেও অদ্বৈতানন্দ। বেদান্ত বা উপনিষদেও আছে "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"। গীতার পঞ্চদশ অধ্যায়ে আছে "যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ"। এখানে হ'ল Supreme transcendent. তিনি জগতে immanent হয়েও transcendent—জগত তাঁর শরীর। পরমহংসদেব বললেন, বেল দেখেছো তো, তার আঠাতে খোলেতে শাঁসেতে বীচিতে সব নিয়ে বেল। নিজেকে সৃজন করলেন out of himself অর্থাৎ তিনি architecture, তিনিই architect. কুমরও তিনি মাটিও তিনি। এই চিন্তাধারা এসে গেল। ওখানে উপনিষদে যেমন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি" বললেন, গীতায় বললেন, "যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্। স সর্ববিদ্ ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত" শেষ কথা হল, ক্ষর গেল, অক্ষর গেল তারপর এলেন পুরুষোত্তম্। যে কথা আমার বন্ধুবর তাঁর কবিতায় * বললেন যে, অন্তরটা যার তাকে দেখলে পুরুষত্ব হারিয়ে নারীত্ব লাভ করে—যে কথা আমাদের পাশ্চাত্য ঋষিরাও ও সুফিরাও বলেছেন - However big or great a man or a mascularly man may be, his soul must be woman if he wants to realise the supreme beatitude and bliss. তাঁর রূপ বর্ণনা করতে দুটী কথা মনে পড়ে—যারা দূর থেকে দেখে "অশ্লীলোকা পতঙ্গকিত", যারা পুরুষ মানুষ, "হস্তমন প্রেক্ষদূরা স্ত্রীস্বরূপম্ বিতর্কি"—সেই ভাবটা ওঁর কবিতার লাইনে এসে গেছে সম্পূর্ণ। দেখুন, ভক্তি কথাটার ব্যুৎপত্তিটা বিশেষ চিন্তা করবার জিনিস। ভজ্ ধাতু থেকে ভক্তি হয়েছে। ভজ্ মানে কি? ভাগ। যে ভজ্ থেকে ভক্তি সেই ভজ্ থেকেই হয়েছে ভাগ। তার মানে ঐ "একত্বেন পৃথক্ত্বেন"। যেই পৃথক হ'ল তবেই ভক্তি। যখন আমি নেই তখন ভক্তি কোথায়। সেইজন্য রামপ্রসাদ বলেছেন, চিনি হওয়া ভাল নয় মা, আমি চিনি খেতে ভালবাসি। গীতায় ভক্তিকে কত উচ্চে স্থান দিয়েছেন। মিশে

* শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিকের "খেয়ার ভাগ্য" কবিতা

যাওয়া যদি compulsory হ'তো তাহলে অষ্টাদশ অধ্যায়ে "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমং সর্বেষুভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্"।—গীতার শেষ কথা হ'ত না। ভাগবতও বলেছেন—সম্পূর্ণ মুক্তাত্মা ভক্তি আস্বাদন হন। জ্ঞানের দ্বারা তাঁকে জানা হয় বটে কিন্তু এরপর পরাভক্তি লাভ করলে তবেই "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্।" ঠিক এই কথাটিই পরমহংসদেব সহজ সরলভাবে একটি ছোট্ট কথায় কত সুন্দর করে বললেন—ভক্তি যেতে মানুষ, সে অন্দরমহল পর্যন্ত যেতে পারে, কিন্তু জ্ঞান পুরুষ মানুষ সে ভেতরে যেতে পারে না। এই সব ছোট ছোট কথার মধ্যে যে বৃহৎ সত্য, universal truth-এর প্রকাশ রয়েছে সেই দ্বার খুলে দেবার জন্যই যেন পরমহংসদেবের আবির্ভাব এবং তাঁর সেই ভাবধারাকে torch bearer-এর মত স্বামী অভেদানন্দ স্বামী সত্যানন্দ প্রভৃতি মহাপুরুষেরা সাহিত্য দর্শন সঙ্গীত ও বাণীর মাধ্যমে প্রচার করে গেলেন।

সব শেষে সভাপতি শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক মহাশয় তাঁর ভাষণে বলেন, ঠাকুর পরমহংসদেব, স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সত্যানন্দকে প্রণাম জানাই। প্রণাম জানাই আশ্রমের স্বামীজী ও মায়েদের। এই কবি সম্মেলন ঠাকুরের খুব প্রিয় ছিল। আশ্রমে গৃহী কবিদের টেনে আনার বিশেষ তাৎপর্য আছে। কাজেই এই সম্মেলন যাতে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হয় আমাদের যেন সেই প্রচেষ্টা থাকে। ঠাকুরের কাছে আমাদের প্রার্থনা—অভেদানন্দ সম্মেলনে কবি সুধীগণ যেন প্রতি বছর মিলিত হয়ে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানের মধ্য দিয়ে পরস্পর সমৃদ্ধিত হতে পারেন।

এরপর কুমারী মল্লিকা বোস ও হীরামণি বোসের দ্বৈতকণ্ঠে "সত্য যদি সুধা" গানটা গাওয়া হলে জ্যোৎস্নাদি "শুনো শুনো ভাইয়া সত্যানন্দ কী বাণী" গানটা অরুণদা ও মৃণালদাকে গাইতে অনুরোধ করলেন। গানটা খুব জমিয়ে গাইলেন তাঁরা। সকলের মনে যেন দাগ কেটে গেল। বলা বাহুল্য এবারও তবলা সঙ্গত করলেন আমাদের গদাইদা। ঠাকুর ও অভেদস্বামীর জয়ধ্বনিতে মুখর করে শেষ হ'ল অভেদ উৎসব। অন্যান্য বিশিষ্ট জনের মধ্যে শ্রীমতী হেমপ্রভা দেবী ও প্রখ্যাত সাংবাদিক সাহিত্যিক শ্রীমনকুমার সেনও সারাক্ষণ উপস্থিত থেকে উপভোগ করেছেন অনুষ্ঠানটি। যাবার সময় মনকুমার বাবু নিজে থেকেই বলে গেলেন, বড় সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে, মনে রাখার মত, খুব ভাল লাগলো।

---

# নীলকণ্ঠ

**শ্রীসুমেন্দ্রনাথ মল্লিক**

মনটা যখন আজ হাল্কা সুনীল
আশ্বিনের আকাশ সামিল,
ছেঁড়া ছেঁড়া দেখা যায় হয়তো বা দু'একটা মেঘ
এখানে ওখানে ভাসে কোনিল আবেগ,
দুঃখের চিন্তায় কেঁপে হ'য়েছে সকেন
জীবনের যেন লেন দেন।

যতদিন মন আছে বেদনায় নীল
নীলকণ্ঠ নামটুকু বলি যদি মিটে যায় সব সড়্গিল।
ঢেউলে ঢেইজী মন নয় কোন' দিন
বেড়িসেবী হ'লেও তো কখনোই নয় অর্বাচীন,
অযোধ্য কিছুই নয় এ কথা বেচালে
বলে তো বলুক যত কালে বা অকালে।

অনেক হুজুম ক'রে গড়া হয় আমদানি মন
জিগীষা জিগির তোলে এখানে যখন।
যেতে গিয়ে দু'একটি চনমনে কাজের তাগিদে
কয়েকটি লাভ্যের বোঝা ঘাড়ে বিঁধে
বিবেকের তাড়নায় জীবনের সুখ—
চিন্তায় চিন্তায় ঠেলে হয়নি কো ব্যথার বিমুখ।

চোখের ইঙ্গিত নিয়ে মানস উদাস,—
তারি ফাঁকে ফাঁকি দিয়ে জমা হয় কত রাশ রাশ
জীবন বেদনা বিষ বিপুল বিস্তারে;
মনের সকল সাধে স্বাদ কি সঞ্চারে
হৃদয়ে আকুতি মেশা, মিলে যাবে অনেক কিছুই
যদিও হয়তো তাই সাতে পাঁচে মন একটুই।

## শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিকের দুটি কবিতা

# ভাগ্যের দেখা

'দেখা দাও' 'দেখা দাও', দিলে ত' বিহ্বল,
সূর্য্য খরতাপে শুষ্ক স্বল্প যা সম্বল।
'দশভুজা এসো মাতা', 'কেন দশভুজা'।
চেয়ে মুখ পেলে দুখ, কি প্রার্থনা পূজা।
ভয় হয় নেত্রে হেরি হে ঐশ্বর্য্যময়ী,
কোথা তব স্তুতি কোথা, দেহি দেহি দেহি।
সিংহপৃষ্ঠে ওঠে হাসি অসুর ঘাতিনী,
সব মিলে সুদূরের জ্যোতির্ব্বাহিনী।
এলে মা মাধুর্য্যময়ী, এলে তুমি উমা,
লুকায়ে দশহাতে এলে কন্যা মনোরমা,
মৃত্তিকার মেয়ে লয়ে করুণা আশ্বাস,
তবুও সংশয় দ্বিধা, না করি বিশ্বাস।
আষাঢ়ে ইত্যক্ত করি সবাই অসুর,
মুচ মোরা, তুমি হাসো, রহ তুমি দূর।
দিব্যচক্ষে হেরি রূপ ব্যথিত অন্তর,
বিহ্বল অর্জ্জুন বলে, সম্বর, সম্বর।
সহস্রবাহুর চাই চতুর্ভুজ রূপ,
পরিচিত সৌম্যরূপ হেরি হয় চুপ,
প্রকৃতিস্থ পার্থ চতুর্ভুজ আবির্ভাবে,
সংজ্ঞালোপও হতে পারে সে রূপ প্রভাবে।
তব রূপ সহে কি দেহ, ভেঙে পলে যায়,
তুমি যদি না দেখাও তব করুণায়।
ভক্তকে বজায় রেখে এসো ভগবান,
তবে ত' হেরিবে দীন হে ঐশ্বর্য্যবান।
তোমারে চিনিতে দাও, ওহে নারায়ণ,
দেখা দাও স্থির কিংবা বাঁকি দরশন।
যে রূপেই এসো যেন চিনিতে হে পারি,
"রূপম্ ইহং প্রপন্ন" বলো হে শ্রীহরি।

# দেখার ভাগ্য

মৃন্ময়রূপ ছদ্মবেশে আশভরে তোমা পুজি,
অন্তরে তুমি বাহির হয়েছো বাহিরে আর না খুঁজি।
পাঁজর হয়েছে তমালতাপী উজল কুঞ্জবন,
মালতী মাধবী ভরেছে ভিতর চাহিনা নিরক্ষণ।
হৃদয় হয়েছে পূর্ণচন্দ্র, রোমাঞ্চ হলো ঘাস,
নারী হয়ে সেছি মিলেছে মাধব অন্তরে চলে রাস।
বংশীবদন লুটাই চরণে পুষ্পাঞ্জলি হাতে,
বার বার চাই তব হৃদয়ের অনুকরণ বাঁশে।
সব মুছে যায় সব মিলে যায়, সমুদ্রের শিহরণ,
রক্তের ঢেউ সিউলির ঢেউ চাকে রাঙা শ্রীচরণ।
সকল অন্ধ আধার সরায় আলোকের বিকীরণ,
ধরণীর ধূলি হোলির আবীর নিত্য বৃন্দাবন।
সকল শব্দ হয়েছে সুরেলা ধ্যানময় কলরব,
সব ঠাঁই হয় পূজিবার ঠাঁই সব ধ্বনি বাঁশীরব।
বুলনের বুলা দুলিছে সদাই নিশ্বাস প্রশ্বাসে,
হৃদয়রাজ্যে লুকানো হেরিনু শ্রীবিষ্ণুর পীতবাসে।

# আকাশ-আঙ্গিনায়

**স্বামী অরূপানন্দ**

ঐ দূর নীলাকাশে—তাকিয়ে আশ মেটে না—
কত যে বারতা, কত ইতিহাস, কত কান্নাহাসির ক্ষণ
লুকিয়ে আছে তার শেষ নেই –
বহুদূর—তত্ত সুর—তত্ত ভাব—
অনন্ত গহিন শুধু আনন্দ অসীম—
ভাষা নেই।
ওর যত কাছে যাও—তত যাবে দূরে
সরে এস হাতছানি দেবে—
জীবনের ছলনার হতাশায়—
ভরে দেবে প্রাণ অকারণ পুলকে।
এ এক আশ্চার্য অশেষ—
প্রাণ ভরে মন ভরে গান ভরে
দেখা যায় ছোঁওয়া যায় না
ভাবা যায়—অতলে ডুব দেওয়া যায়
আগলে রাখা যায় না—
মনে প্রাণে সুরে সুরে অনুভূতির পরশ নাও
পূর্ণ হবে শান্ত সেলবতায়।

ভাবতে ভাবতে তুমি হয়ে উঠবে বিরাট
বুকটা হবে বড়
সবাইকে আপন করে জড়িয়ে নেবে—
সব একাকার
ভয় নেই – দোলা নেই – দুই নেই—
দুই মিশেছে একে
আকাশ সায়রে আপনহারা আনন্দে
নীলাকাশে ভাবের তুফান চলে
স্বর্গ চেতনার দ্বার খুলে যায়
প্রকাশিত হয় আনন্দঘন রূপময় দেবতা
স্নিগ্ধ জ্যোতির বলয়ে
হারিয়ে যাই আমি- পরিপূর্ণ একা—
সাথী মোর চির হয়েছে সেথায়
শুধু সে আর আমি
আমি আর সে—
ঐ অরূপের নীল আঙ্গিনায়।

———

# ॥ আনন্দময়ী ॥

**শ্রীঅমলকৃষ্ণ গুপ্ত**

তবুও আশ্বিন এল তীরপারে সলজ্জ ভঙ্গিতে
এখনো সজল চক্ষু দীর্ঘায়ত অবগুণ্ঠিতার
এখনো কাটেনি মেঘ, বাজে নাই মধুর সংগীতে
মিলনের দীপ্ত রাগ, শুনি শুধু বিষণ্ণ মল্লার।
তবুও আশ্বিন আসে চড়াই পাখির মতো ভীরু,
কী কথা বলতে চায় মৃদুস্বরে শুনি কি শুনিনা,
জানি তা অচিরে হবে নিরুপমা এখন যা নিরু
ছড়াবে আকাশ জুড়ে আনন্দের সপ্তস্বরা বীণা।

তখন পাখির ডাকে ঝাঁকে ঝাঁকে ফোটাবে কুসুম
অপরাজিতার নীলে পরাজিত আকাশের নীল
তখন ছুটির সুর কেড়ে নেবে সকলের ঘুম
খুশির জোয়ারে ডাকবে পুরাতন এ বিশ্বনিখিল।
সেই জোয়ারের মঞ্চে আবির্ভাব আনন্দময়ীর
মেঘ রৌদ্র তাঁর গায়ে পড়ে আছে শান্ত, ধীর স্থির।

# মহাজীবন

( স্বামী অভেদানন্দ স্মরণে )

বেলা দেবী

যোগভ্রষ্ট মহাঋষি—
কবে কোন মুহূর্তের দুর্বলতা বশে
অসমাপ্ত ছিলো মহাতপ।
অসম্পূর্ণ সেই তপস্যার
সিদ্ধি করে আর একবার
জন্ম নিয়েছিলে মর্তে বিকৃষিত দিব্য মহাভাবে
পৃথিবী ধন্য হলো তোমার পবিত্র আবির্ভাবে।
কঠোর তপস্যা পাশে মহাযোগি। বেঁধেছো নিজেকে
চেয়েছো আত্মার মুক্তি
সুদুর্লভ সুধাক্ষয় মোক্ষ পাদপের
শ্রেষ্ঠ কামনা যাহা মানব জন্মের।
আধ্যাত্মিক জগতের চাবিখানি
পেয়েছিলে হাতে
সমর্পণ করেছিলে জীবন যৌবন
পরম ইষ্টের সাধনাতে।
জীবের কল্যাণ করে নিয়েছিলে মহাব্রত ব্রত
তুমি শুদ্ধপ্রাণ
অজ্ঞান জীবেরে দিলে অমৃত লোকের
সত্য পথ সন্ধান—
'সুখ নেই প্রবৃত্তি ও ভোগে
পরম আনন্দ লাভ জীবচিত্ত নিবৃত্তি ও ত্যাগে
এ সংসার শুধু খেলাঘর
এ জীবন একান্ত নশ্বর।'
শ্রীরামকৃষ্ণের তুমি সদা ছিলে লীলা সহচর
মমতার বাহু দিয়ে বন্দী করতে তোমায়
পারেনি তো ঘর
সেই শিশু বয়সেই শুনতে পেয়েছো তুমি
মহা আহ্বান—
শ্রীরামকৃষ্ণের পায়ে সঁপিয়াছো কি নিষ্ঠার
দেহ মন প্রাণ।
ক্ষুদ্র সুখ তুচ্ছ অর্থ ভোলাতে কি পারে?
পরমার্থ ধরা দেয় যারে।
সত্য যাহা—নিত্য যাহা নাই যার ক্ষয়
সে আনন্দামৃত পান করে তুমি
হলে মৃত্যুঞ্জয়।

---

# গান

মায়া বসু

প্রাণটা যদি যায় রে চলে?
যাক না চলে।
হরিরামকৃষ্ণ বলে
নাচবো রে দুই বাহু তুলে
সত্যানন্দ-সারদা মায়ের ছেলে বলে
যেমন নেচেছিল গৌর নিতাই
হরেকৃষ্ণ নাম বলে।

শ্রীমৎ ঠাকুর শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেবের শ্রীচরণে

# আত্মাহুতি

শ্রীঅজিতভূষণ সরকার

সাক্ষী মোর আকাশের ঐ সূর্য তারা
বন-উপবন থেকে
তুলি পুষ্পরাজি
গাঁথিয়াছি মালা।
পরায়ে কণ্ঠে তাঁর
নিজেরে হারিয়ে আমি হই সর্বহারা।

# হিন্দুধর্মের সারতত্ত্ব

ডঃ শ্রীদুর্গাদাস বসু

( অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি, কলিকাতা হাইকোর্ট )

[ পূর্ব প্রকাশিতের পর ]

আমরা পূর্বেই দেখিয়াছি, যে বৈদিক যুগেও অমূর্ত এবং অব্যক্ত ব্রহ্মের সঙ্গে সঙ্গে মূর্ত এবং ব্যক্ত[৩৭] ঈশ্বরের ধারণা ছিল। দ্বিতীয় প্রশ্ন হইল যে 'ব্রহ্ম' কি নির্গুণ না সগুণ বা উভয়ই। নিরাকার, অব্যক্ত ব্রহ্ম নিষ্ক্রিয়, সুতরাং সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ কোনও গুণই তাঁহাতে আরোপ করা যায় না। কিন্তু যে ঈশ্বরের কার্য সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, তিনি নিশ্চয়ই সগুণ, কারণ ঐ সকল কার্য ঐ তিনটি গুণেরই ফল।

এই বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করিতে হইলে আমাদিগকে সৃষ্টিতত্ত্ব[৩৮] ( ২য় অঃ ) পুনরনুধাবন করিতে হইবে এবং ব্রহ্ম এবং ঈশ্বরের তাত্ত্বিক প্রভেদটি স্মরণ করিতে হইবে। হিন্দুধর্মে সৃষ্টিতত্ত্ব এক ব্যাপক বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, যদনুসারে ব্রহ্মের বিবর্তনে ঈশ্বরের উৎপত্তি। নির্গুণ ব্রহ্মই সৃষ্টির উদ্দেশ্যে, স্বীয় মায়ার সহায়তায় সগুণ ঈশ্বরত্ব ধারণ করেন[৩৯] এবং বিশ্বকে পরিচালিত করেন।[৪০] এই মায়াবী ঈশ্বর স্বীয় শক্তি প্রভাবে বহুরূপ ধারণ করিলেও, তিনি এক এবং অদ্বিতীয়।[৪১] সমগ্রবিশ্বই তাঁহার অবয়ব স্বরূপ।[৪২] এইরূপে নির্গুণ, নিরবয়ব ব্রহ্মের সহিত বিশ্বরূপ পরমেশ্বরের সগুণাবস্থানে-জ্ঞানমার্গী উপনিষদেও কোনও বিরোধ বা অসামঞ্জস্য মনে করা হয় নাই। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে, ব্রহ্মজ্ঞানলাভের জন্য পরমেশ্বরকে 'বিশ্ব বিরূপে'[৪৩] উপাসনার ব্যবস্থা আছে।

নির্বিকার, নির্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সবিশেষ ঈশ্বরের যে কোনও ভেদ নাই, উভয়ই একই সত্তার ভিন্নাবস্থা,—তাহা বুঝাইবার জন্য ব্রহ্মসূত্রে সর্প ও তাহার কুণ্ডলীর[৪৪] উপমা দেওয়া হইয়াছে। নির্গুণ ব্রহ্ম যখন মায়াধীশ হইয়া জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহার কর্তার পদগ্রহণ করেন, তখন তিনিই হন সগুণ ব্রহ্ম।[৪৫]

উপাসনার প্রথম অধ্যায় হইতেছে এই সগুণ ব্রহ্মের অর্চনা।[৪৬]

উপনিষদ্‌সমূহ পাঠ করিলে অচিরেই পরিলক্ষিত হয় যে, পরমাত্মাকে বুঝাইতে কোথাও ঈশ্বরলিঙ্গ আবার

---

৩৭। শ্বেত ( ১।৮ )—'সংযুক্তমেতৎ·····বিশ্বমীশঃ

৩৮। ভাগবত ( ২।৬।৩১ )—'নারায়ণে ভগবতি···সর্গাদ্যবরূপঃ স্মৃতঃ', শ্বেত। ।১৬-১৭ ।···স বিশ্বকৃৎ·····ঈশনায়'।

৩৯। শ্বেত ( ৩।১ ) -'য একো জালবানীশত·····ঈশনীভিঃ'।

৪০। শ্বেত ( ৩।২ )—'একো হি রুদ্রো ন দ্বিতীয়ায় তস্থুঃ·····'।

৪১। শ্বেত ( ৪।১০ )—'তত্তাবয়বভূতৈস্তু ব্যাপ্তঃ সর্বমিদং জগৎ'।

৪২। শ্বেত ( ৬।৫ )—'তং বিশ্বরূপং ভবভূতমীড্যম্ ····· পূর্বম্'।

৪৩। ব্রহ্মসূত্র ( ৩।২।২৭ ) 'উভয়ব্যপদেশাত্ত্বহিকুণ্ডলবৎ'। [যে সর্প নিষ্ক্রিয় অবস্থায় কুণ্ডলবদ্ধ, সেই সর্পই কখন রবিবার উদ্দেশ্যে ফণা আকৃতি ধারণ করে; সর্প একটিই। রামকৃষ্ণের কথায় ( কথামৃত, ( ৫।৩১ ):—যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি·····যখন তিনি নিষ্ক্রিয় তখন তাঁকে ব্রহ্ম বলি, আবার যখন সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার কার্য করেন, তখন তাঁকে শক্তি বলি'।]

৪৪। শ্বেত ( ১।৩ )—তে ধ্যানযোগানুগতা····· স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্·····'

৪৫। গীতা ( ১৮।৪৬ ) 'যতঃ প্রবৃত্তিভূতানাং—মানবঃ'। (সমগ্র ভক্তিমার্গই এই সগুণবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত )।

কোথাও পুরুষ লিঙ্গ ব্যবহার করা হইয়াছে। নিষ্কল, নিষ্ক্রিয় এবং অব্যক্ত ব্রহ্মকে নৈর্ব্যক্তিক ক্লীবলিঙ্গ সর্বনামের দ্বারাই সংজ্ঞিত করা হইয়াছে; পরন্তু, যেখানে পুংলিঙ্গ সর্বেশ্বর,[৪৯] ঈশানঃ[৫০]; মহেশ্বরঃ[৫৮], বিশ্বতোমুখঃ[৫৯] ইত্যাদি গুণবাচক শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, সেখানে সৃষ্টিকর্তা, সগুণ ঈশ্বরকে সূচিত করা হইয়াছে। সর্বোপরি, ব্রহ্মের যে দুইটি রূপ মূর্ত এবং অমূর্ত, তাহা বৃহদারণ্য কেনোপনিষদে স্বার্থহীন ভাষায় উক্ত হইয়াছে—'দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে—মূর্তং চৈবামূর্তং চ...'[৬০]।

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে রুদ্রের 'দক্ষিণ মুখ'[৬১] দেখিবার প্রার্থনা করা হইয়াছে এবং এই একই অর্থে ঈশোপনিষদে 'কল্যাণতমরূপ'[৬২] দেখিবার প্রার্থনা আছে। অরূপ, অক্ষর ব্রহ্মকে ভক্তি করা সম্ভব নহে; কিন্তু যাঁহার 'দেবে পরা ভক্তিঃ'[৬৩] আছে, তাঁহারই নিকট ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভাসিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ, সাধারণ্যে প্রচলিত ধারণা যে, বৈদিক যুগে অগ্নি, সূর্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক শক্তিকেই দেবরূপে স্তুতি করা হইত, তাহা ঠিক নহে। বহু বৈদিক মন্ত্রে রুদ্র,[৬৪] শ্রী, ভারতী, শিব[৬৫], সরস্বতী[৬৬] প্রমুখ সগুণ দেবতার স্তবও আছে। আবার উপনিষদ্‌গুলিতে 'রুদ্র'[৬৭], 'শিব'[৬৮], 'কালী'[৬৯], 'করালী'[৭০], 'দেবী'[৭১], শব্দের ব্যবহার আছে।

এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পিত হইলে সাকারত্বের অনুমান দুঃসাধ্য হয় না, কারণ যখনই ঈশ্বরকে ভূতাধিপতি[৭২], ভূতপাল[৭৩], 'হিরণ্যগর্ভের জনয়িতা'[৭৪], বলা হয় তখন এক জগৎ পিতার মূর্তি আমাদের চোখে ভাসিয়া ওঠে। তাঁহার আকৃতিকে আমরা মনুষ্যরূপ দান করি কারণ আমরা মানুষ এবং মনুষ্যকেই পরিদৃশ্যমান জগতের শ্রেষ্ঠ জীব বলিয়া গণ্য করি। এইরূপে নিরাকার ব্রহ্মের ধ্যান হইতে সাকার মূর্তিপূজার পৌঁছিতে তিনটি মানসিক স্তরের বিকাশ লক্ষণীয়—(ক) সগুণ কল্পনা; (খ) সাকার কল্পনা; (গ) সাকারের প্রতিষ্ঠা কল্পনা। প্রথম স্তরটি আমরা আলোচনা করিয়াছি।

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তে ( ১০।১২৫ ) আদ্যাশক্তি মহামায়াকে জগৎ প্রসবিত্রী মাতৃরূপে বর্ণনা করা হইয়াছে এবং বলা হইয়াছে দেবমানবগণ বহুস্থানে আমাকে নানাভাবে আরাধনা করে। ইহা ব্যতীত, ঋগ্বেদে বিশ্বদুর্গা, সিন্ধুদুর্গা, অগ্নিদুর্গা নামের উল্লেখ আছে। কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যক ও নারায়ণ উপনিষদে 'দুর্গা'[৭৯] দেবীর নাম আছে, শুধু তাহা নহে, তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়া আরাধনার ব্যবস্থা আছে -

'তামগ্নিবর্ণাং তপসাজ্বলন্তীং বৈরোচনীং কর্মফলেষু জুষ্টাম্[৮০]। দুর্গাং দেবীং শরণমহংপ্রপদ্যে সুতরসি তরসে নমঃ ॥ (২।২)

( ক্রমশঃ )

---

৪৯। মাণ্ডূক্য (৬); মু ( ৩।৪।২২ )। ৫৭। শ্বেত ( ৪।১১ )। মুণ্ড ( ৩।৪।২২ )।

৫৮। শ্বেত ( ৪।১০ ); ( ৬।৭ )। ৫৯। শ্বেত ( ৪।২১ )। ৬০। মুণ্ড ( ২।৩।১ )।

৬১। শ্বেত ( ৩।৩ )। ৬২। ঈশ ( ১৬ )। ৬৩। শ্বেত ( ৬।২৩ )।

৬৪। ঋগ্বেদ ( ১।১১৪।১-১১ ) এই সম্পূর্ণ সূক্তটিই রুদ্রদেবের নিকট প্রার্থনা।

৬৫। বৈদিক সন্ধ্যামন্ত্র 'ওঁ নমঃ শিবায় চ শিবতরায় চ'।

৬৬। ঋগ্ ( ১।৩।১০-১২ ); (৭।৯৫ ১৬); ( ১০।১৭২।১); বিষ্ণু (১।২৪।১৬-২১)।

৬৭। শ্বেত ( ৪।২১ )। ৬৮। শ্বেত (৪।১৪)। ৬৯। মুণ্ডক ( ১।২।৪ )।

৭০। মৈত্রী ( ৪।২ )—'....স ভূতানামধিপতির্ব ভূব...' ; মু (৩।৪।২২) ...'ভূতাধিপতিরেষ ভূতপাল...'।

৭১। শ্বেত ( ৩।৪ ) ...হিরণ্যগর্ভং জনয়ামাস —'।

৭২। বাজিবা উপনিষদ্ (১০।১।৭) ; নারায়ণোপনিষদ্ (১।৩৪) 'কাত্যায়নায় বিদ্মহে... —দুর্গিঃ প্রচোদয়াৎ'।

৭৩। নারায়ণ ( ২।২ )।

# খুলনায় সমবায়ের সেবা— প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে

শ্রীভূপেন্দ্র নাথ সরকার ( শান্তিনিকেতন )

যখন আমি কলেজের ছাত্র তখন হইতেই আমি সমবায় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমার সম্পর্কীয় মাতুল রায় বাহাদুর যামিনীমোহন মিত্র Registrar of co-operative socities ) এর সংস্পর্শে আসি।

তাঁহাকে সমবায়ের জনক বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তিনি ইংলণ্ডে British Empire Exhibition ( Wehnbly ) তে—ভারতীয় camp-র কর্ণধার ছিলেন। কুমুর টুলির G. Pal—তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতায় খ্যাতি লাভ করেন। কলেজে অর্থনীতির ছাত্র-রূপে co operative movement সম্বন্ধে পড়াশুনা করিয়াছিলাম।

আমার শিক্ষাগুরু, অধুনা স্বর্গত Mr. R. N. Gilchrist র আপ্রাণ চেষ্টায় আমি Khulna Girls School এ শিক্ষকের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলাম। Extra-cular activities এ আমার খুব আগ্রহ থাকায় আমি স্কুলের co-operative-এ Store Hanorary Secretary প্রধান শিক্ষক কর্তৃক নিযুক্ত হইলাম। সরকীয় ভাষায় বলিতে ইচ্ছা হয়,—"I took up with alacrity the honorary position—to serve both the teachers and the students.

সমবায় ভাণ্ডারের দুইটি বিভাগ ছিল : ছাত্রদের ব্যবহার্য পুস্তক, খাতা পেনসিল stationary প্রভৃতি। ২) ছাত্রদের ( residents of the hostel ) অপর কর্মীদের জন্য চাউল সরবরাহ করা।

যদিও officially আমি stores-র সামগ্রীক ভাবে Secretary ছিলাম, কারণ আমি প্রথম বিভাগ দেখিতাম, আর বিদ্যালয়ের Drawing master মহাশয় চাউল বণ্টনের সমগ্র দায়িত্ব লইয়াছিলেন।

Stores-র দায়িত্ব আমার এত বেশী ছিল যে বড় ছুটিতে আমার জন্মস্থান ফুলপরে যাইয়াও কাগজ পত্র—ledgers, all account books প্রভৃতি লিখিতে হইত। ইহা সম্পূর্ণরূপে নিঃস্বার্থ কাজ।

হঠাৎ একদিন শ্বেতাঙ্গ I. C. S man (Cooperative Department)র Registrar মহোদয় Inspection-এ হাজির। আমি class-এ পড়াইতেছি ; ছাত্ররা খবর দিল,—"সাহেব আসিয়াছেন ; খবর দিলেই আপনাকে storesএ যাইতে হইবে।" আমার বুক দুর-দুর ( palpitate ) করিতে লাগিল ; ভাবনা ঐ চাউলের ভাণ্ডার লইয়া। আমি কখনো উহার stock taking করি নাই। Head master মহাশয় ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের উপর নির্ভর করিয়াছিলাম। আমার ধারণা ছিল, শিক্ষক মাত্রেই সৎ।

Head master, Mr. Rakshit খুব বুদ্ধিমান ব্যক্তি ! তিনি জানিতেন, আমার Sectionএ গলদ নাই। আমার অনুপস্থিতিতে আমার section সাহেবকে দেখাইয়া সন্তুষ্ট করিলেন। তিনি চাউলের গুদাম দেখা আবশ্যক মনে করিলেন না। I might say, the Headmaster got the better of the I. C. S man !

আমি আমার সততা ও নিস্বার্থ সেবার জন্য দায় হইতে মুক্ত হইলাম। চাউলের stock-taking হইলে ও হিসাব পত্র দেখিলে গলদের জন্য আমাকেই দায়ী হইতে হইত, আমার চাকুরী খতম হইতই, হইত আরো কিছু, শ্রীঘর-বাস। Honesty pays in the long run, ভগবান সহায় হইলেন।

অল্প দিন পরেই co-operative Departmentর auditor, Mr. Das Gupta inspectionএ আসিলেন। উঁহাদের inspection—thorough and detailed. Lo ! and behold ! উনি খুব ভালো মন্তব্য করিলেন : "The Head master Mr. A. C. Rakshit and the Secretary, Mr. B. N. Sarkar work night and day for the co-operative stores and tries to generate the spirit of co-operation all around"—সত্যঃ জয়তে। এইরূপ কাজের আর্থিক মূল্য কিছু নাই ; মূল্য—আত্মতৃপ্তি ও কর্তব্য-সাধন।

# অভেদানন্দ সত্যানন্দ প্রণাম

হাওড়া রামকৃষ্ণপুর হাই স্কুলে ৩ই অক্টোবর 'অভেদানন্দ সত্যানন্দ প্রণাম' সভা নিবেদিত হয়, সত্যানন্দ ফাউণ্ডেশন ও অন্যান্য সংস্থার যুগ্ম উদ্যোগে। বেলুড় মঠ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ মিশন মন্দিরের পক্ষ থেকে শ্রীচিত্তরঞ্জন কর সন্ন্যাসিনী মাতা অর্চনাপুরীর বিশেষ বাণী ও তাঁদের পাঠ করেন। ইংরাজীতে স্বামীজির সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীযুক্ত অজনবরণ; হিন্দিতে অভেদানন্দ শতবর্ষের স্মারক গ্রন্থ থেকে সংকলন, অনুবাদ করে বলেন আচার্য শালিগ্রাম শুক্লাজী। ইণ্ডিয়ান নেশনাল মেডিকেল এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রীসুবোধ বেদজ, শিক্ষা বিভাগের উপ-অধিকর্তা ডঃ পি. সি চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক শ্রীআনন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ স্বামী অভেদানন্দজী, স্বামী সত্যানন্দদেব ও ভারতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন অধ্যাপক শ্রীহরিপ্রসাদ। শ্রীমান তরুণ আঢ্য ও হাওড়া কালীমাতা সেবা সমিতি অভেদানন্দ গীতি আলেখ্য ও বৈদিক সঙ্গীত পরিবেশন করেন। হাওড়ার বিশিষ্ট সমাজ সেবক ডাঃ গিরিজানন্দ ও বহু সংস্থা ও ব্যক্তি অনুষ্ঠানে যোগ দেন। স্বামী নির্বেদানন্দজীর বাণী পাঠান্তে সভা শেষ হয়।

শ্রীচিত্তরঞ্জন কবির আহ্বানে হুগলী জাগরী সংঘ ও অন্যান্য সংস্থার উদ্যোগে স্বামী অভেদানন্দ স্মৃতি পর্যালোচনা চক্র ৭ই অক্টোবর হুগলী কোতরং এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান শিক্ষক শ্রীভুবনেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়; জোজনা পর্ষদের শ্রীদেবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা অভেদানন্দজীর বিজ্ঞান ভাবনা, শিক্ষা দর্শন ও বর্তমান শিক্ষার অসম্পূর্ণতার দূরীকরণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন। অধ্যাপিকা বাণী দেবী সভাপতিত্ব করেন।

বাগনান আজাদ হিন্দ্ সমিতির একদিন ব্যাপী শিবির উপলক্ষ্যে স্বামী অভেদানন্দ ও নেতাজী সম্বন্ধে আলোচনায় ও জাতীয় জীবনের পুনর্গঠন সম্বন্ধে ভাষণ দেন শ্রীসুবোধ বেদজ, শ্রীশম্ভু চৌধুরী, শ্রীচিত্তরঞ্জন কর। প্রধান অতিথি রূপে অধ্যাপক শ্রীহরিপ্রসাদ স্বামী অভেদানন্দ মহারাজের ও স্বামী শিবানন্দ মহারাজের সহিত নেতাজীর সম্বন্ধের নানা কাহিনী উপস্থাপন করেন এবং সন্ন্যাসিনী শ্রীমাতা অর্চনাপুরীর যুগ বিশ্লেষণী বাণী পাঠ করেন জিলার শিক্ষাবিদ। নিরক্ষরতা আন্দোলন ও গঠনমূলক সংস্থার বহু প্রতিনিধিরা এই শিবিরে মিলিত হন।

# আশ্রম সংবাদ

পুজো আসছে। পুজো। মহাপুজো। সারা বছরের মহাপ্রতীক্ষার ফল বলতে গেলে তিন দিনেই ফুরিয়ে গেলেও বরানগর শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে শ্রীশ্রীদারুণীর সাড়ম্বরোৎসব এবারও বেশ সমারোহের সঙ্গেই অনুষ্ঠিত হ'ল। ১৮ই অক্টোবর '৭৭, ১লা কার্তিক —মহাষষ্ঠীর ভোর হতেই আশ্রমে বেজে উঠল মাঙ্গলিক সানাইয়ের আগমনীর সুর। ঠাকুরের লেখা "মার ভাকে আয় দি সাড়া" আগমনী গান গেয়ে আশ্রমের সাধু ভক্তের প্রভাতফেরী পাড়াপড়শীদের জানিয়ে এলো মার আগমনবার্তা। সন্ধ্যায় হলঘরে নিত্যপূজিতা বিগ্রহ বিল্বমূলা সারদা কমলমূলা দুর্গারূপে দশপ্রহরণধারিণী হয়ে বসলেন সিংহাসন আলো করে। পূজার প্রাথমিক আয়োজন শেষ করে মুহাসলা পূজক সুনীলদা ও তন্ত্রধারক মিঠুদাকে নিয়ে প্রবেশ করলেন পূজাস্থলিতে। সুরু হ'ল মার বোধন আমন্ত্রণ অধিবাস পূজা। গতবার শারীরিক অসুস্থতার জন্য মিঠুদা (শ্রীগৌরীশঙ্কর চৌধুরী) সিউড়ী থেকে আসতে পারেন নি। এবার তাই তাঁর কণ্ঠে প্রথম মন্ত্রোচ্চারিত হওয়া মাত্র সেই আগেকার দিনের মহাপূজা পরিবেশ যেন আপনা আপনি সৃষ্টি হয়ে গেল। মিঠুদা ও সুনীলদার যুগ্মকণ্ঠে দেবীর মহাময় ধ্বনিত হতেই গমগম করে উঠল সারা পূজাস্থলি—সেই সঙ্গে বীরভূমের ঢাক কাঁসর-ধ্বনি পূজাময় করে তুললো আশ্রমের আকাশ বাতাস। সপ্তমীতে মা কলাগ্রূপে পূজো নিলেন। অষ্টমীর ভৈরবীবেশে ব্রাহ্মমুহূর্তে মার সন্ধিপূজা ও শত ভক্ত কণ্ঠে "জয় জয় চণ্ডিকে" গানের সাথে সাথে ১০৮টি প্রদীপে আরতি এক অনির্বচনীয় আনন্দ অনুভব করালো। মহানবমীতে মা রাজরাজেশ্বরী রূপ ধরলেন। দশমীর সকালে পূজান্তে সভাপতি স্বামী নির্বেদানন্দজীর কাছ থেকে মার প্রসাদী শান্তিবারি মাথায় নিয়ে সকলে পেলেন পরম আনন্দ। মধ্যাহ্নে গঙ্গায় পট বিসর্জনের পর মণিমন্দিরে ও শ্রীমন্দিরে সাধু ও ভক্তরা নাচি, তলোয়ার খেললেন, ধুনুচীনৃত্য করলেন, সবশেষে ঘুরে ঘুরে নাম করে প্রণাম জানালেন ঠাকুর ও মার চরণে।

পূজার কদিনই বহু ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ অন্নপ্রসাদ তো পেয়েছেনই উপরন্তু অনেক গরীব ও দুঃস্থ ছেলেমেয়েদের বেশ কিছু নতুন জামাকাপড়ও বিতরণ করা হয়েছে। পূজার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দের পরিচালনায় বরানগর "চাঁদনী সঙ্ঘে"র শ্রীঅর্চনা মার লেখা "মুখলং কুল নাশনম্" নাটকাভিনয় এবং দক্ষিণাঞ্চলের ব্রজবিশোর কালীকীর্তন সম্প্রদায়ের কালীকীর্তন বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রজবিশোর সম্প্রদায় আমাদের ঠাকুরের রচিত অনেকগুলি শ্যামাসঙ্গীত পরিবেশন করে সকলকে খুব আনন্দ দিয়েছেন।

দশমীর সন্ধ্যায় বিজয়া সম্মেলনে প্রণাম ও আলিঙ্গন নেয়ে প্রাণে আনন্দ নিয়ে ফেরা হল সান্ধ্যাশ্রমে।

# World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

**Comparative Psychology - Its nature :**

Animals in laboratory are studied to yeild information about training animal pets in home or in circus or as hunting and working companion. This is also useful in the case of the animals in the zoological gardens. This is also useful in the wild life and natural resources conservation.

Again many problems cannot be tackled if the animals are not used for research purposes, such as operational or environmental control. Lastly, theoretical reasons justify the use of animals in experimental studies.

**Historical Origin of Comparative Psychology :**

It was Darwin who first gave the evolutionary hypothesis. Difference in structure and behaviour among different genera and species would be quantitatively different but qualitatively alike.

But Dr. Wundt was the first man to use comparative approach in methodology. But before this, medical and physiological men were using animals for their experiments. But Aristotle was the first man to study animal behaviour. But possibly before this, Aristotle studied animal psychology as the first initiator in this line. He relied on empirical methods. In prehistoric ages, we find some indication of crude observational studies for training or other purposes of animal.

**Methodology :**

The general method for comparative psychologly is observation. There are two groups of method employed by psychologists : (1) those who do not want to be disturbed by outside elements but make use of laboratory equipments and (2) those who proceed by the method of naturalistic observation. But the dividing line is more or less arbitrary

**The innate behaviour : The organism in its environment :**

There are two definitions of the term instinct. The first is why certain behavioural pattern occurs as an aggressive attitude is explained by the instinct of pugnacity. This is explanatory. The second is descriptive with no explanation of the behaviour, such as, homing of pigeons, migration of fish etc. These are divided into learned and unlearned.

**Historical Background :**

Historically it is as old as 2500 B. C. in the Greek literature. In the middle ages the difference of man and animal behaviour was noticed. Darwin's concept of the term was accepted by eminent scholars. The concept of instinctive behaviour was accepted by scholars as a basic principle in the beginning of the twentieth century

**Objection to Instincts :**

Asch says; the doctrine of evolution has dehumanised man.

Beach refers to an anti-instinct revolt. In discarding instinct psychologists appeared

to lose interest in the study of genetic determinants of behaviour. This war failed, the leaders had to assume two-factor theory of behaviour—each behaviour is innately determined and reflex in nature or is learned. But a further division had to be accepted, as given by Beach, as the unlearned complex pattern of behaviour. This was the definition of Beach for instinct. Though scientifically instinctive behaviour was accepted long over the last 25 years, the major researches were on learning and motivation.

**Environment :**

Environment is that factor either internal or external that affects the organism.

**Time :**

This is the dimension which is correlated with maturational and other developmental changes in the organism measured with metric system such as seconds, minutes etc.

**Organism in Environment :**

The psychologists manipulate the environment with a narrow time limit and the organisms are partially inbred or are very large in number to eliminate genetic differences.

No behaviour is complete without the three dimensions of time, heredity and environment. In formulae, B=f (HET) f is function, H is heredity, E is environment and T is time. Time dimension is qualitative but underlying the theory of instinct is the assumption of invariable behaviour. The question is whether a given behaviour is answerable.

# On Earthquakes

**M. V Jagannadha Rao**

The most grim and gruesome of all natural calamities is the earthquake the devastating effects of which at times may be unparalleled. The extent of damage caused by an earthquake naturally depends upon the area it strikes and its intensity. One may run away from a flood, a tidal wave or a volcano or escapefully or partially the ravages of a cyclone by appropriate and timely action, but the suddenness and swiftness with which earthquake comes, any escape from it may be rendered out of question, for even if one runs out to an open ground, the earth under his very feet may split and swallow him. In this article, it is proposed to outline a few important aspects of the earthquake.

An earthquake is the passage of vibrations from the source of disturbance inside the earth called Focus, till the waves reach the surface of the earth and vanish. Sensitive modern instruments called seismographs show that the outer part of the earth trembles almost continuously. Most of the tremors are not perceptible to our senses but are recorded instrumentally.

The mythological belief is that the earthquake is caused when the Goddess holding the earth changes her hand due to strain. Scientifically speaking, when the strain on the rocks increases, energy is released which takes the form of earthquake. Several causes have been

attributed to the origin of the earthquakes but the ultimate cause is the accumulation of strain on the rocks.

A renowned seismologist, H. F. Reid, has put forward "Elastic Rebound Theory" which states that rocks rupture when submitted to elastic strains greater then they can endure. Such strains may be due to sudden volcanic eruption in a nearby region or displacement of earth's crust by some other agency. When the strain increases continuously the rocks reach a point of rupture when they rebound under elastic stress until the strain is partially or wholly relieved. The release of energy sets up earthquake waves which are recorded by seismologists. The normal depth of origin is believed to be 12 to 16 kms.

**Causes for the earthquakes :**

1. The interior of the earth is always in a hot condition and the heat is lost gradually from the surface of the earth. The loss of heat from the earth's crust may also cause some disturbance which may result in an earthquake.

2. Gradual and sudden changes are always taking place on the surface of the earth like formation of mountains or falling of landslides. Such processes may disturb the local equilibrium of the earth resulting in an earthquake.

3. It has been observed that earthquakes frequently occur in regions of mountain building. The earthquake belt of the world coincides with the young mountain belt of the world.

4. Due to sudden volcanic explosions, the rocks in the nearby region may be disturbed to such an extent as to give rise to vibrations. Earthquakes are very common in regions of volcanic activity but places situated far away from volcanoes are not much susceptible.

5. Radioactivity of certain rocks is also explained as one of the causes for an earthquake. The heat continuously given off by radium bearing minerals cause melting of certain rocks and bring about fissures and result in an earthquake.

**Effects of earthquakes :**

The effects of earthquakes are among the most destructive of natural phenomena and are even more terrifying than the volcanic erruptions. While a volcano gives warning and sufficient time, an earthquake gives no warning before its arrival.

1. In some cases, the earthquakes are accompanied by sounds lasting for a few seconds. The Bihar earthquakes were preceded and accompanied by sounds variously described as comparable to the sounds of several aeroplanes or an approaching goods train

2. The most important effects are on the earth's surface. In the Assam earthquake of June 12th, 1897, which occurred at 5·15 p. m. the ground vibrated more than 100 times a minute and produced disastrous effects. Stones were thrown vertically off the ground. Nearly 30,000 sq. miles of area was affected. Although loss of life was not much, landslides, fissures and displacement of alluvial soil was immense.

3 Fissures are the natural concomitant of earthquakes. In the Bihar earthquake of 1934, there was great fissuring as evidenced by twisting of railway lines and bridges and surface distortions. Fissures are very common near river banks, roads and railway embank-

ments. Concentric fissures are noticed around heavy buildings. In the Quetta earthquake of 1935, there was a 65 mile long fissure from the town with a depth of 30 feet.

4. Sand and water are usually discharged from fissures due to compressional effects of waves. Sand issues out even through houses and factories. Hot water sprouts up like a geyser upto a few feet in height. The hotness of water suggests the depth from which it comes up.

5. The most important effect is seen in mountain regions. The loose rocky material accumulated at the foot of the hill due to weathering is thrown by the shaking produced by the earthquake. The damage due to landslides at times may be colossal when entire mountain-side villages are wiped out

6. Another common effect is the subsidence and elevation of land. In the Rann of Cutch earthquake of 1819 there was an upward slip of 20 feet on one side of the fault and a downward slip of 10 feet on the other side. In the Californian earthquake of April 18th, 1906, there was an abrupt movement along 270 miles causing destruction. The great Yakut Bay (Alaska) earthquake in 1899, resulted in an abrupt vertical displacement that lifted a part of the coast by about 50 feet

7 The water level in many rivers rises high due to earthquakes as a result of general rise in ground water level. Often rivers change their course effacing towns and villages.

8. Earthquakes with the focus under the ocean floor causes vertical displacement of ocean bottom setting up tidal waves or seismic sea waves. They are stated as Tsunami by Japanese seismologists. The consequences of such sea waves are equally ruinous. In the Lisbon earthquake of Nov 1st 1755, (occurred on All Saints' day), a gigantic 40ft high sea wave, swept half-a-mile inside the city, washing away ships, buildings, bridges and people out to sea. Three other such waves of about 18ft at intervals of 4 hours made it still worse. Altogether half the city was destroyed. As a result of Karachi earthquake which occurred on Nov. 28th. 1945, a tidal wave washed away several villages along the 100 mile coast from Karachi to Koti Bunder. Japan in 1703 and 1896 and Peru in 1868 suffered very much from the disastrous Tsunamis. The number of victims of a single inundation of this kind was estimated at 1,00,000. The vast sea waves are also felt over the whole oceans when travel with incredible speed ranging from 300 to 500 miles per hour. Tsunamis with epicentre near Japan have crossed the Pacific in about 12 hours.

**Geographical distribution of Earthquakes** : Even though earthquakes occur in many parts of the world their places of origin are confined to mainly to certain parts of the earth. It has been observed that severe earthquakes are generally found where volcanoes are usually active and also where the young folded mountains are active. These three are generally found along two regions One region is around the Pacific Ocean called circum-Pacific-Belt. This belt includes Chile, Peru, Central America, Mexico, California, Western part of Canada, Aleutian Islands, Kamchatka, Japan, Phillippines, Indonesia, New Zealand and other associated arcuate island groups. The second group passes across the continents and is called Alpine-Mediterranean-Trans-Atlantic-Belt. This belt includes North Africa, Spain, Italy, Greece, Turkey, Iran, Northern India and Burma (along the Himalayan foothills). (To be continued)

"SAFEX" LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

*Manufactured by :—*

**Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.**

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22.

Gram : "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (3 Lines)

# WORLD PHILOSOPHY

by

**Swami Satyananda**

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২নং প্রাণকৃষ্ণ সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ ৯ শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত। ফোন : ৩৪-১০৮৪ মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী উমানন্দ

প্রতি সংখ্যা ·৭৫ পয়সা বার্ষিক মূল্য টাঃ ৮·০০

Regd. No. WB/NC-34 • BHABMUKHEY • Phone : 52-7133

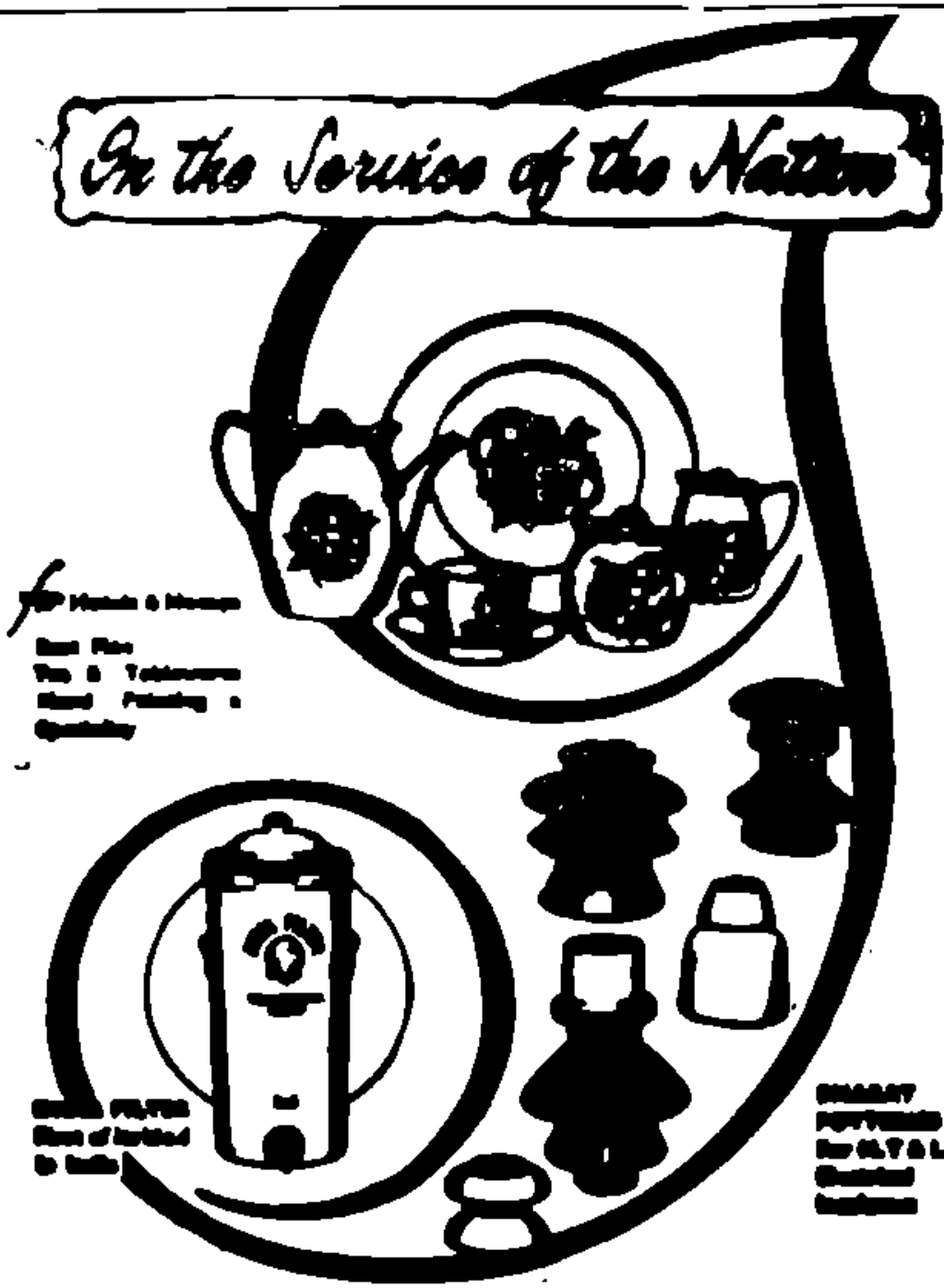


INDIA POTTERIES LIMITED
31, BHARATTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents—COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta-1.

প্রচ্ছদ পরিচিতি : শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সমাধি অবস্থার শ্রীকরযুক্ত।

প্রচ্ছদ-শিল্পী—শ্রঃ শঙ্কর চৈতন্য। যুগ্ম-পত্রিকা সচিব স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ সম্পাদক—স্বামী ধীরানন্দ স্বামী মৃগানন্দ। প্রকাশ সচিব—স্বামী সত্যানন্দ, স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দ স্বামী অমলানন্দ ও শ্রঃ তারক চৈতন্য।